ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

৬১ বর্ষ ২৬ সংখ্যা ।। ১৮ ফাল্গুন, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১০) ২ মার্চ, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৪০০০ বাংলাদেশী বন্দী নাজেহাল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে বন্দি ৪ হাজারের বেশি অনুপ্রবেশকারীকে (বাংলাদেশী) নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে রাজ্য সরকার। বাংলাদেশী বন্দিতে জেল উপচে পড়ায়, জেলদপ্তর মুখ্যমন্ত্রীকে এর একটা বিহিত করতে বলেছে। কিন্তু বাংলাদেশীদের কীভাবে সেদেশে ফেরানো হবে তা নিয়ে কোনও গ্রহণযোগ্য সমাধানসূত্র মিলছে না। কারণ,

বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশীদের আইনি পথে ফেরত নিতে চাইছে না। এদিকে বিভিন্ন জেলে বন্দি বাংলাদেশী মহিলা ও কচি-কাচারা প্রায়ই দেশে ফেরার দাবিতে অনশন করছে। তাদের অনেকেরই জেলে সাজা খাটার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। এই ধরনের বন্দিদের জানখালাস বন্দি বলা হয়। শুধু জেলেবন্দি থাকাই নয়, বছরের পর বছর চার হাজারের বেশি বাংলাদেশীর খাওয়া, পড়া এবং চিকিৎসার যাবতীয়

(এরপর ৪ পাতায়)

ভোটের মুখে বিজেপিকে ঠেকাতে কংগ্রেসের নোংরামি

লিবেরহান কমিশন-রিপোর্ট প্রকাশের উদ্যোগ

গূঢ় পুরুষ ।। বিজেপি আসন্ন লোকসভার নির্বাচনে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে প্রচারে প্রথম সারিতে নিয়ে আসা এবং প্রবীণ নেতা লালকৃষ্ণ আদাবানীকে দেশের ভাবি প্রধানমন্ত্রী ঘোষণার পরেই কংগ্রেস পরাজিত হওয়ার আতঙ্কে ভুগছে। সম্ভবত সেই কারণেই সোনিয়া নন্দন রাহুল গান্ধী প্রতি সপ্তাহেই এখন গুজরাট সফরে যাচ্ছেন। সেখানে অসার মোদী নিন্দাই রাহুলের নির্বাচনী অস্ত্র। কিন্তু গুজরাটের আম জনতা মোদীর নিন্দা শুনতেই চাইছে না। তাই কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব এবার ব্যক্তি কুৎসা রটনাকে অন্য এক মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার গোপন ষড়যন্ত্র করেছে। এই ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য হচ্ছে বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের ও গুজরাতের বিগত দাঙ্গার দায় লালকৃষ্ণ আদবানি ও নরেন্দ্র মোদীর উপর চাপিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা।

এই কাজটি কংগ্রেস সরাসরি করলে কেউ বিশ্বাস করবে না। জনমানসে প্রভাব ফেলবে না। তাই সোনিয়ার নির্দেশে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকার চাপ সৃষ্টি করে বাবরি ধ্বংসের ১৭ বছর পর লিবেরহান কমিশনের রিপোর্ট ঠিক নির্বাচনের মুখে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেছে। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি ধ্বংসের পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসীমা রাও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এম এস লিবেরহানের নেতৃত্বে এক সদস্য তদন্ত কমিশনকে ধ্বংসের জন্য দায়ী ব্যক্তি ও সংগঠনদের চিহ্নিত করতে বলেন। বিগত ১৭ বছরে তদন্ত কমিশনের

সোনিয়া গান্ধী

জাস্টিস লিবেরহান

মেয়াদ ৪৭ বার বৃদ্ধি করা হয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার লিবেরহানকে জানিয়ে দিয়েছে যে, ৩১ মার্চের পর কমিশনের মেয়াদ আর বৃদ্ধি করা হবে না। লিবেরহানও জানিয়ে দিয়েছেন তিনি ৩১ মার্চের আগেই তাঁর তদন্ত রিপোর্ট সরকারকে দিয়ে দেবেন। এই তদন্ত রিপোর্টে নিশ্চিতভাবেই লালকৃষ্ণ আদবানী সহ প্রথম সারির বিজেপি নেতাদের অভিযুক্ত করা হবে। নিশ্চিতভাবেই দায়ী করা হবে হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরঙ্গ দলের প্রধান নেতৃত্বকে। এরপর সংবাদ মাধ্যম লাগাতার প্রচার চালাবে। বিজেপি নেতৃত্বকে চিহ্নিত করবে মুসলিম বিরোধী বলে। এই প্রচার হিন্দু জনমানসে কোনও দাগ কাটবে না। তবে মুসলিম ভোটদাতারা নিঃসন্দেহে উল্লসিত হবে।

কংগ্রেস কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আশা যে উল্লসিত মুসলিম ভোটদাতারা প্রতিদানে কংগ্রেস প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জেতাবে। কিন্তু বিজ্ঞানী নিউটন তাঁর তৃতীয় সূত্রে বলেছেন, প্রতিটি ঘাতের একই রকম শক্তিশালী প্রত্যাঘাত হয়। মনে হয় নিউটনের সেই সতর্ক বার্তা কংগ্রেস নেতৃত্ব ভুলে গেছেন।

উন্নয়ণের দূত নরেন্দ্র মোদীকে আটকাতে ব্যর্থ কংগ্রেস আবার সেই ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গার বিষয়টিকে ইস্যু করছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গঠিত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রাঘবনের বিশেষ তদন্ত দলের রিপোর্টও মার্চ মাসের কোনও এক সপ্তাহে প্রকাশ করা হচ্ছে। বাজি রেখে বলা যায় যে এই তদন্ত রিপোর্টে নরেন্দ্র

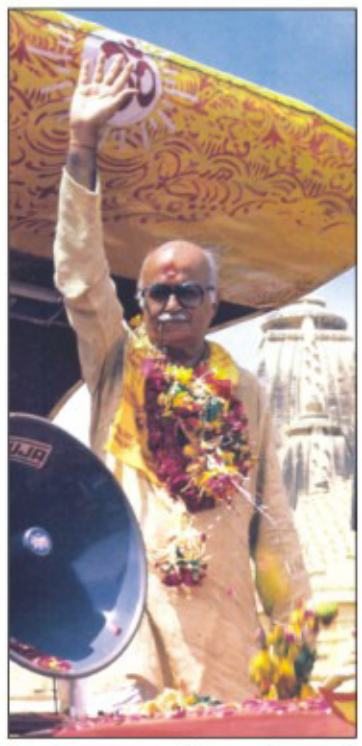

রামরথে আসীন আদবানী

মোদীকে দাঙ্গার জন্য প্রধান অভিযুক্ত করা হবে। চেষ্টা চালানো হবে মোদীকে ফৌজদারি মামলায় জড়িয়ে এমন ব্যতিব্যস্ত করা যাতে তিনি বিজেপির নির্বাচনী প্রচারে সময় দিতে না পারেন।

নির্বাচনে এমন নোংরামির জবাব দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় কীভাবে দেবে সেটাই তখন দেখার।

রাজ্যে মিড-ডে মিল অসঙ্গতি ও দুর্নীতির অভিযোগ

বিশেষ সংবাদদাতা ।। সম্প্রতি ক্যাগের পেশ করা পারফরম্যান্স অডিট রিপোর্ট নম্বর ১৩/২০০৮ -এ ধরা পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষাদপ্তরের নানা অসঙ্গতি ও দুর্নীতি। ২০০২ থেকে ২০০৭-এ দেখানো মিড ডে মিলের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার কারচুপি করা হয়েছে। রান্না খরচ হিসেবে বরাদ্দের ৯২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা বেআইনিভাবে অন্যদিকে চালান করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০০৬-২০০৭ -এ ১৩৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা খরচ না করেও ইউটিলাইজেশন দেখিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ৫২ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা মহাকরণে ফেলে রেখে ৮ মাস ১১ দিন ও ১২৬ কোটি টাকা ২ মাস এবং ১০০ কোটি টাকা ১ মাস বাদে জেলায় পাঠানো ধরা পড়েছে।

ক্যাগের রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গে করুণ হাল প্রত্যক্ষ হয়েছে, ৭১ শতাংশ স্কুলে পাকা রান্নাঘর নেই এবং ২৯ শতাংশ স্কুলে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ড্রপ আউটের হার হচ্ছে ৭৫.১২ শতাংশ। বুনিয়াদি শিক্ষায় ভারতের ৩৫টি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের নীচে কেবল বিহার ও ঝাড়খণ্ড।

ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ এডুকেশনাল প্ল্যানিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন -এর সমীক্ষা রিপোর্ট গত ১৩ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়েছে। ওই সমীক্ষার অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস অফ এডুকেশন (রুরাল) ২০০৮ রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে। ২০০৭-এ রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার যে মান ছিল, ২০০৮ এ তা সামগ্রিক ভাবে আরও খারাপের দিকে।

(এরপর ৪ পাতায়)

কাশ্মীর সীমান্তের মতোই বিপজ্জনক মুর্শিদাবাদ সীমান্ত

নবকুমার ভট্টাচার্য।। কাশ্মীর সীমান্তের মতোই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে মুর্শিদাবাদ সীমান্ত। মুম্বাই কাণ্ডের পরেও মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসন নিশ্চুপ। অথচ এই জেলার জলঙ্গী থেকে ফারাক্কা পর্যন্ত কাঁটাতারের বেড়াবিহীন দীর্ঘ ১৩৪ কিমি ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে ঢুকছে নিষিদ্ধ সংগঠনের সক্রিয় সদস্য থেকে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র। সেই অস্ত্র মুর্শিদাবাদ থেকে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে। এর মধ্যে সব অস্ত্রই যে বাংলাদেশ থেকে এসেছে তা নয়। সীমান্ত ঘেঁষা মুর্শিদাবাদের বেশ কিছু গ্রামের গোয়ালঘরে এবং বাড়ির গোপন কুঠুরিতে গড়ে ওঠা অস্ত্র কারখানায়। অত্যাধুনিক অস্ত্র তৈরি করে মোটা টাকার বিনিময়ে তা অনায়াসে সরবরাহ করা হচ্ছে — রাজ্য এবং দেশের বিভিন্ন জায়গায়। অবশ্য মুর্শিদাবাদের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে এই বেআইনি অস্ত্র কারখানার খবর এই প্রথম নয়, এর আগে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেও এই বিষয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন গোয়েন্দারা।

পাকিস্তান সীমান্তের মতোই উদ্বেগজনক অবস্থা বাংলাদেশের সীমান্তে। বাংলাদেশ সীমান্ত জঙ্গিরা নীরবে ব্যবহার করছে অনুপ্রবেশ ও যাতায়াতের করিডর হিসেবে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে যেমন আই এস আই মদতপুষ্ট জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবির

রয়েছে , বাংলাদেশেও তেমনি অন্তত ১৩০টি জঙ্গি ঘাঁটি রয়েছে। এই জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবিরগুলি ভবিষ্যতে মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তে প্রতিষ্ঠিত করার প্রক্রিয়া চলছে। এই উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে জনবিন্যাসের হেরফের করার পরিকল্পনা নিয়েছিল বাংলাদেশের গুপ্তচর সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল অব ফোর্সের ইন্টেলিজেন্স (ডি জি এফ আই)। এ কাজে তাদের সহায়তা করেছিল পাক গুপ্তচর সংস্থা-আই এস আই এবং সিমি। আরও উদ্দেশ্য এখানে উত্তরবঙ্গসহ উত্তর পূর্বাঞ্চলে যেসব জঙ্গি সংগঠন কাজ করছে, তাদের সঙ্গে কোঅর্ডিনেটিং মেকানিজম প্রজেক্ট করতে যাতে আই এস আই এর সুবিধা হয়।

মুর্শিদাবাদ সীমান্ত দিয়ে যে সমস্ত জঙ্গিরা ঢুকছে, তারা যাতে আত্মীয় বন্ধুর ছদ্ম পরিচয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিশে যেতে

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

থোরিয়াম প্রযুক্তি ভারতের বিদ্যুৎ সমস্যা মেটাতে পারে ঃ মোহন ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ বিদ্যুৎশক্তির চাহিদার সমস্যা সমাধানে এক অভিনব উপায়ের পথ দেখালেন। গত ১০ ফেব্রুয়ারি দিল্লীতে সঙ্ঘের সম্পর্ক বিভাগের আয়োজিত বৈজ্ঞানিকদের এক সমাবেশ অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদনে থোরিয়াম প্রযুক্তিবিদ্যা কাজে লাগোনোর কথা তিনি বলেছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি আরও বলেছেন, থোরিয়াম প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করলে ভারতবর্ষ অচিরেই বিদ্যুৎশক্তিতে স্বনির্ভর হবে। থোরিয়াম প্রযুক্তির মতো ভারত নিজস্ব মৌলিক শক্তিগুলোর সদ্ব্যবহার করলে বাইরের দেশের সঙ্গে অসমারিক পরমাণু চুক্তি সই করার কোনও প্রয়োজন নেই। বরং বিদেশী রাষ্ট্রগুলোই ভারতের কাছে ছুটে আসবে।

শতাধিক বিজ্ঞানীর উপস্থিতিতে শ্রীভাগবত বলেছেন, সরকার অন্তত এটা নিশ্চিত করুক যে ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি প্রকৃতই ভারতের উন্নয়নে সহায়ক। বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে এই সম্মেলনে বলা হয়, হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা'র শতবর্ষ এবং জগদীশ চন্দ্র বসুর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকীর সন্ধিক্ষণে সারাদেশের বিজ্ঞানীদের ভারতবর্ষের প্রাচীন বৈজ্ঞানিক সম্পদের রসদগুলোকে রক্ষা করা উচিত। সেটাই হবে এই মহান বিজ্ঞানীদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধার্ঘ্য। সম্মেলনে অনেক বিজ্ঞানী ভারতীয় বিজ্ঞানীদের বিদেশে চলে যাওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন তুললে, মোহনজী বলেন, বিষয়াসক্ত যুবক বিজ্ঞানীদের অবশ্যই দেশের কথা ভাবা উচিত। দেশে যথেষ্ট সম্মান নেই এই ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, দেশের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও গত ৬০ বছরে ভারতের বিজ্ঞানীরা পরমাণু শক্তিতে সমৃদ্ধি লাভ করেছে, চাঁদে তেরঙ্গা নিয়ে যেতে পেরেছে। সেই অর্থে বিভিন্ন বিদেশী বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক আবিষ্কারগুলি অনেকক্ষেত্রেই মানবজাতির বিপক্ষে কাজ করে চলেছে। যেদিন থেকে বিজ্ঞান আধ্যাত্মিকতার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, সেদিন থেকেই সৃষ্টির সুখ ধ্বংসে পরিণত হচ্ছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে মানবজাতির উন্নয়নের কাজে লাগাতে বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতাকে এক সূত্রে বাঁধতেই হবে।

শ্রীভাগবত নতুন প্রজন্মের দিকে আঙ্গুল তুলে বলেছেন, যারা ভারতের কোনও ক্ষেত্রেই কোনও প্রগতি নেই বলে দাবি করছে, তাদের এদেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা উচিত। 'যদিও এই ঘটনায় তারা দায়ি নয়। কারণ এখনও আপামর ভারতবাসীকে সেই মেকলেদের ভুল শিক্ষাপদ্ধতিতে পড়াশোনা করে বড় হতে হয়'। আজকে ভারতে প্রতিভা, ক্ষমতা সমান ভাবে থাকলেও দৃষ্টিভঙ্গির বড় অভাব। বস্তুত ভারত এমন একটি দেশ যে নিজ গুণসম্পদেই মহান, কারোর নকল করা জ্ঞানে নয়। মোহনজী স্পষ্ট ভাষাতে জানান, নিজ বলেই শক্তিমান হয়ে বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে ভারতের প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। তিনি বলেছেন, আমাদের প্রত্যেকজনের ভাগ্য দেশের ভাগ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই প্রত্যেক বিজ্ঞানীকে দেশের কথা ভাবতে হবে। অন্যদিকে গঙ্গা ড্যাম প্রকল্প নিয়ে তার বক্তব্য, বড় বড় ড্যাম করে গঙ্গার স্বাভাবিক গতিপথে বাঁধা না দিয়ে সরকারের উচিত প্রচুর ছোট ছোট ড্যাম বা বাঁধ তৈরি করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা।

এই সময়

যাত্রা হল শুরু

দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেও, গান্ধীনগর তথা গুজরাট তাঁর প্রেরণা হয়ে থাকবে। গত ২০ ফেব্রুয়ারি একথা ঘোষণা করে গান্ধীনগর থেকেই 'আমাদের যাত্রা হল শুরু' বলে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রচারকার্য শুরু করলেন লালকৃষ্ণ আদবানী। তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে উন্নয়ণ এবং সুশাসন নিয়ে বারবার গুজরাটের নাম যেভাবে উঠে এসেছে, তাতে গান্ধীনগরের প্রার্থী হিসেবে আমি গর্বিত। উল্লেখ্য, এই কেন্দ্রে শ্রী আদবানী পরপর চারবার জিতেছেন। ডিলিমিটেশনের ফলে বিধানসভা কেন্দ্রগুলির রদবদল হলেও তিনি বিচলিত নন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, উন্নয়ণ যেখানে সার্বিক তথা সুষম, সেখানে কোনও বিভাজনই তাঁর বিজয়ে ভাঁজ ফেলতে পারবে না।

নেপথ্য তালিবান

প্রকাশ্যে কখনও তালিবানদের গালমন্দ না করলেও, তালিবানী আচরণের কথা তুলে ধরে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে বিন্দুমাত্র পিছপা হলেন না একদল বুদ্ধিজীবী। সম্প্রতি দিল্লীতে আয়োজিত অল ইন্ডিয়া নিউজ পেপার এডিটরস কনফারেন্সে বক্তব্য রাখতে এসে একদল সাংবাদিক ভারতীয় সংস্কৃতিতে তালিবানী প্রভাব বাড়ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা মূলত ভারতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণপন্থীদের দিকে তাকিয়েই এমন বক্তব্য রাখেন। কিন্তু তালিবানদের নৃশংসতার কথা একবারও উল্লেখ করেননি তারা। এতে শ্রোতাদের মধ্যেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তারা বক্তাদেরই তালিবান বলে গুঞ্জন করেন।

আত্মহত্যা বৃদ্ধি

গত পাঁচ বছরে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষক আত্মহত্যার ঘটনাও ব্যাপকহারে বেড়েছে। কৃষি দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত কয়েক বছরে কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা শুধু মহারাষ্ট্রেই চল্লিশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি হিসেবে এই সংখ্যাটা ৪ হাজার ২৩৮ জন। একই সময়ে অন্ধ্রপ্রদেশে কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যাটা ১ হাজার ৭৯৭ জন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কৃষকদের প্রতি কেন্দ্র সরকারের উপেক্ষাই এর প্রধান কারণ।

বায়ুসেনার উপগ্রহ

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নিজস্ব অবস্থান আরও জোরদার করতে, মহাকাশে নজরদারি উপগ্রহ প্রেরণ করতে চলেছে ভারতীয় বায়ুসেনা। এয়ার চিফমার্শাল ফালি মেজরের বক্তব্য অনুযায়ী, ২০১০-এর মধ্যে বায়ুসেনার পক্ষ থেকে একটি উপগ্রহ প্রেরণ করা হবে। যার মূল লক্ষ্য একদিকে যেমন নিজস্ব পরিকাঠামো সম্পর্কে সচেতন রাখা, অন্যদিকে তেমন বিপজ্জনক দিকগুলি সম্পর্কে অবহিত করানো। ইসরো-র তৈরি এই উপগ্রহের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ভূমি ও আকাশ পথে বিভিন্ন ধরনের সামরিক প্রয়োজনে কাজে লাগবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সংস্কৃতি সংরক্ষণ

অরুণাচল প্রদেশের জনজাতিদের কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ নিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র মোজি রিবা। এক বিবৃতিতে রিবা জানান, গ্লোবালাইজেশনের প্রভাবে অরুণাচলে অবস্থিত অসংখ্যা জনজাতিদের নিজস্ব ঘরানা লুপ্ত হতে চলেছে। 'মাউনটেন আই' নামক প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি জনজাতিদের প্রথাগুলি আবার বাঁচিয়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে জানান।

বিতর্কে অমর

লোকসভা ভোটের আগেই দলের মধ্যে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে গেলেন সমাজবাদী পার্টির নেতা অমর সিং। কিছুদিন আগেও ফিল্মস্টার রাজ ববর — অমর সিং-এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখ খুলে ছিলেন। তার প্রেরিপেক্ষিতে দলের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হওয়ায়, খোদ সভাপতি মুলায়ম সিং বিবৃতি দিয়ে জানান, অমর সিং জনপ্রিয় নেতা। দাঁড়ালেই জিতবেন। কিন্তু দলের স্বার্থে তিনি দাঁড়াবেন না। কিন্তু মুলায়মের কথাকে নস্যাৎ করে দলের বিধায়ক আজম খান সম্প্রতি বলেছেন, অমর সিং, লোকসভা তো দূরের কথা গ্রামসভাতেই জিততে পারবেন না। বিশেষজ্ঞদের মতে, অমর সিংকে নিয়েই মুলায়মের মর মর অবস্থা।

অবসর নেই

কেন্দ্রে মনমোহন সিং সরকারের ক্যাবিনেটে মন্ত্রীদের গড় বয়স ৬৭ বৎসর। তাদের মধ্যে ৮ জনের বয়স ৭০-এর বেশি। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী লালকৃষ্ণ আদবানীর বয়স ৮১ বৎসর। রাজনীতিকদের অবসরের কোনও বয়স নেই।

তালিবানী আগ্রাসন

তালিবানদের জমি দখল রুখতে সাধারণ জনগণের হাতে অস্ত্র তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাক সরকার। ইসলামাবাদ কর্তৃক প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে, পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে দ্রুতগতিতে তালিবানরা তাদের দখলদারি বাড়াচ্ছে। সাধারণের মধ্যে চেতনা এবং তালিবানী দখলদারির বিরুদ্ধে সক্রিয় হতেপ্রায় ত্রিশ হাজার রাইফেল বিলির ব্যবস্থা করেছে পাক-সরকার। যাতে সরাসরি জনগণ তালিবানদের বিরুদ্ধে নামতে পারে।

প্রচার শৈলী

প্রচার কার্যে বাড়তি চমক দেখানোর পথে হাটতে নারাজ বলে জানিয়ে দিল বিজেপি। এক বিবৃতিতে বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়, পার্টির সদস্য তথা কর্মীদের দিয়েই এবার প্রচার চালানো হবে। সেক্ষেত্রে হেমামালিনী, স্মৃতি ইরানি, বিনোদ খান্না, ধর্মেন্দ্রই যথেষ্ট। বাড়তি চমক দলের স্বাভাবিক কাজকর্মের উপর যেমন প্রভাব ফেলে তেমন অর্থ ও সময় নষ্ট হয়। এবার সেদিকে না গিয়ে, ছোট ছোট সভার মাধ্যমেই বিজেপি প্রচার কার্য চালাবে বলে জানানো হয়।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বর্বররা ভারতের দ্বারপ্রান্তে

পাকিস্তান এখন ঘোর সংকটে। পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ অনেকটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন। ইতিপূর্বে পাকিস্তানের এমন অবস্থা কখনও হয়নি। সম্প্রতি আমেরিকা পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দেওয়া স্থগিত রাখিবে বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছে। আর ঠিক এই সময়েই পাকিস্তান তালিবানদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান বন্ধ রাখিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। ফলে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, বিশেষত সোয়েট উপত্যকায় এক নাটকীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে। তালিবানরা এতটাই আক্রমণাত্মক হইয়া উঠিয়াছে যে, পাকিস্তানকে শান্তি ক্রয় করিতে তাহাদের সহিত চুক্তি করিতে হইয়াছে। এই চুক্তিতে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যাহা সোয়েট উপত্যকা নামে পরিচিত, সেখানে শরিয়ত আইন বলবৎ করা যাইবে। পাকিস্তান যে কতটা শঙ্কিত এই ঘটনাই তাহার প্রমাণ। আর পাকিস্তান যেহেতু প্রতিবেশী দেশ, তাহার উত্তাপ ভারতেও লাগিতে পারে।

শরিয়তের বিধান বলবৎ করিবার অর্থ, সরকারি প্রশাসনের উপর হস্তক্ষেপ স্বীকার করিয়া লওয়া। অর্থাৎ পাকিস্তানের মধ্যেই সমান্তরাল আরও একটি সরকারের অস্তিত্ব থাকিবে। একই ধরনের ডামাডোল বালুচিস্তানসহ সমগ্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ জুড়িয়াই চলিতেছে। এই এলাকার অনেক অংশেই তালিবানরা পাক-সামরিক বাহিনীকে পর্যুদস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই এলাকায় অবস্থা এতটাই কাহিল যে তালিবানদের কাছে পাকিস্তান সরকারকে নিঃশর্তে নতজানু হইতে হয়। পাক প্রেসিডেন্ট জারদারির সম্মতি ব্যতীত এই ঘটনা সম্ভব নয়। তালিবানরা তাহাদের প্রভাবাধীন এলাকায় শরিয়ত আদালত চালু করিবে এবং ইহার সংখ্যাও ক্রমশ বাড়িতে থাকিবে।

আমেরিকার ৯/১১ ঘটনার পর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ শুরু হইয়াছিল, তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান নিজেদের সার্বভৌমত্ব আমেরিকার কাছে এতটাই বন্ধক রাখিয়াছে যে অনুমতির কোনও তোয়াক্কা না করিয়াই মার্কিনীরা সেনা, বিমান ও নৌ-বাহিনীর অভিযান চালাইয়াছে। এইসব ঘটনাই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের পক্ষে হানিকর বলা যাইতে পারে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উপর তালিবানদের এই জয়কে গোপন রাখা যাইবে না। একটি বিদেশী শক্তির নির্দেশে পাকিস্তান নিজেই শরিয়ত বিধান বলবৎ করিতে বাধ্য হইল— ইসলামিক সমাজে ইহা একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই চুক্তির একটি ধারা হইল যে, পাক সেনা তখনই গুলি ছুঁড়িতে পারিবে যদি উগ্রবাদীরা প্রথমে গুলি ছুঁড়িয়া থাকে। আঘাত করিবার ক্ষমতা নয়, কেবল প্রত্যাঘাতের ক্ষমতাই পাক সেনাবাহিনীর রহিয়াছে।

অবস্থা এমনই পর্যায়ে পৌঁছাইয়াছে যে, পাকিস্তান কূটনৈতিক দিক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং পরিস্থিতির এই পরিবর্তনে আমেরিকা ক্ষুব্ধ। পাকিস্তানের শীর্ষ নেতারা আশংকা প্রকাশ করিয়াছেন যে, পাকিস্তান তালিবানদের দখলে চলিয়া যাইতে পারে। আজ ইহা হয় তো ততটা স্পষ্ট নয়, কিন্তু পাকিস্তানী নেতারা ইসলামের পক্ষে বিষয়টিকে এক ভয়ঙ্কর বিপদ সংকেত বলিয়া মনে করিতেছেন। এই এলাকায় এখন শুধু মাদ্রাসা নয়, সাধারণ স্কুলগুলিও জেহাদের কারখানায় পরিণত হইবে। আর শরিয়ত হইল ইহার মূল ভিত্তি। পাকিস্তানে তালিবানদের শরিয়তের বিধান চালু হইলে জেহাদি ও মৌলবাদীরা যে নতুন শক্তিতে বলীয়ান হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

ইহা সকলেরই জানা যে, পাকিস্তান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক হইতে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র। আমেরিকার সাহায্য ব্যতীত পাকিস্তান এমনকী চার সপ্তাহ চালাইতে পারিবে না।

পাকিস্তানের সকল প্রবীণ নেতারাই প্রথম হইতে ভাবিয়া ছিলেন যে, ইসলামই একসূত্রে বাঁধিয়া রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট। জেনারেল জিয়া-উল-হক এই উদ্দেশ্যেই জিহাদি ইসলামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন। সামরিক বাহিনীতে তিনি 'ইসলামিক যুদ্ধ'-এর ধারণাটি অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। তবে তাহার এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছিল। পাকিস্তানের নেতাদের মধ্যে বিশেষত জেনারেল পারভেজ মুশারফই প্রথম বিশ্ববাসীকে জানাইয়াছিলেন— পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের কেন্দ্র নয়, বরং সন্ত্রাসবাদের শিকার। সেইসময় হইতে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে কথাটি বহু আলোচিত। বিষয়টি হিন্দু পুরাণের ভস্মাসুরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, যে তাহার সৃষ্টিকর্তাকেই ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

পাকিস্তান কখনও আন্তরিক ভাবে ওসামা-বিন-লাদেন-এর অনুসন্ধান করে নাই। আমেরিকাকে এই বিষয়ে স্তোকবাক্য শুনাইয়াছে, সাহায্য করে নাই। সম্প্রতি মার্কিন উপগ্রহ ওসামা-বিন লাদেনের গোপন আস্তানার হদিশ পাইয়াছে। এই উপগ্রহের ছবিতে লাদেনকে হাঁটিতে দেখা যাইতেছে। এখন আমেরিকার ওবামা প্রশাসন সতের হাজার কমাণ্ডো পাঠাইবার সিদ্ধান্ত লইয়াছে। অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে ইহা সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। আগামী দিনগুলি তাই পাকিস্তানের পক্ষে খুবই সংকটজনক।

পাকিস্তানের এই অস্থিরতা ভারতের পক্ষে বিপদ সংকেত। তালিবানদের রাজত্ব অমৃতসর হইতে গাড়িতে মাত্র পাঁচ ঘন্টার পথ। অর্থাৎ বর্বর-রা প্রায় ভারতের দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, ভারতবর্ষ জুড়িয়া যে অসংখ্য মাদ্রাসা রহিয়াছে, সেগুলি তালিবান তৈরির কারখানা। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের তালিবানদের সহিত হাত মিলাইতে তাহারা কখনও দ্বিধা করিবে না। ভারতের পক্ষে ইহা এক ভয়ঙ্কর বিপদ সংকেত।

কৃষিকে বাদ দিয়ে বিকল্প কর্মসংস্থানের পথে কৃষক সভা কেন?

এন সি দে

সম্প্রতি সি পি এম-র কৃষক সংগঠন 'কৃষক সভা' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, তারা আর কৃষকদের কৃষি সম্পর্কিত কোনও দাবি-দাওয়া এবং জমির অধিকার আদায়ের লড়াই করবে না। এতো দেখি ভূতের মুখে রাম নাম। এতদিন ভূমি-সংস্কারের নামে জমি দখল করে অভাবী কৃষকদের মধ্যে বিলি করে যারা দলীয় সংগঠনের ভিত মজবুত করেছে, তারাই আজ কৃষিকে ছেড়ে বিকল্পের সন্ধানে কেন? ভূমি সংস্কারের অস্ত্র কী ভোঁতা হয়ে গেল? নাকি ভূমিতে এখন আর রস নেই? ভূমি সংস্কার কৃষির উন্নতির জন্য না করে বরং প্রমোটারদের হাতে জমি তুলে দিয়ে কৃষকদের সেই নির্মাণ শিল্পে গতর খাটানোর বিকল্প কর্ম-সংস্থান করাটাই কৃষি-বিপ্লব মনে করছে কি? গিরগিটির নয়া প্রজন্ম কমিউনিস্টদের এই নয়া কৃষি-বিপ্লব নিয়েই এই আলোচনা।

কমিউনিস্টদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অভাবী মানুষদের অভাব নিয়ে রাজনীতি করা। যাদের অভাব থাকে তাদের অভাব সহজে মিটিয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে দলে টানা সহজ। এটাই কমিউনিস্টরা সর্বত্র প্রথম অবস্থায় তা করে থাকে। সংঘবদ্ধ ছিনতাই যদি একটি রাজনৈতিক দলের নীতি হয়, তাহলে তো ছিনতাই করাটা আর অসামাজিক অনৈতিকও বলা যায় না। অতএব এই দলেই ভেড়ো। এই দলে কেড়ে খাওয়ার নাম বিদ্রোহ। বিবেকের বালাই নেই। ১৯৬৭ সালে ক্ষমতা দখল করেই কমিউনিস্টরা এই লুঠ করার মন্ত্রই চাউর করেছিল গ্রামের গরীব কৃষিজীবীদের মধ্যে। এর নাম ভূমি সংস্কার অর্থাৎ পরের জমি কেড়ে নিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা। এবার এই ভাগ বাটোয়ারায় কমিউনিস্টরা যেহেতু পার্টির বাইরে কাউকে ভাগ দেয় না, সেহেতু অভাবী চাষীরা কমিউনিস্ট পার্টিতে নাম লেখাতে বাধ্য হয়েছে। এইভাবে গ্রামাঞ্চলে কমিউনিস্টরা তাদের পার্টির ভিত মজবুত করছে। প্রচারে ওস্তাদ কমিউনিস্টরা সেদিন গলা ফুলিয়ে এই জমি দখলের কথা প্রচার করেছে। হরেকৃষ্ণ কোঙার তখন প্রচার করেছিলেন যে, তারা ১৯৬৭ সালের আট মাসের মধ্যেই ২.৩২ লক্ষ একর জমি ২.৩৮ লক্ষ চাষীর মধ্যে বাৎসরিক লাইসেন্সের ভিত্তিতে বন্টন করেছে।

কিন্তু মজার কথা হল ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত কংগ্রেস সরকারও কিন্তু জমি উদ্ধার করে খাসকরণ করেছে ৪.৫০ লক্ষ একর এবং ১৯৭০ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে করেছে আরও ৪.১৮ লক্ষ একর জমি। অথচ ১৯৭৭ সালে এই কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই কমিউনিস্টরা প্রচার চালালো— "বিগত তিরিশ বছরে কংগ্রেস সরকার জমিদারি প্রথার অবসান ও মৌলিক ভূমি সংস্কার নীতি বাস্তবায়িত করতে শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়েছে"। তাই আমাদের ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসান। আমরা উদ্বৃত্ত ও বেনামী জমি অধিগ্রহণ করে ভূমিহীন এবং গরীব চাষী ও ক্ষেত মজুরদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করব ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৫ সাল থেকেই কার্যকর ছিল। তাতে বর্গাদারদের সুরক্ষার বিধানও আছে। ১৯৭০-এ তা সংশোধন করে বর্গাদারদের ৭৫.২৫ অনুপাতে ভাগ পাওয়ারও অধিকার সংযোজন করা হয়েছিল। পুনরায় ১৯৭২ সালে বিধানসভায় পাশ করা হয় বর্গাচাষের উত্তরাধিকার আইন। সুতরাং ভূমি সংস্কারের একমাত্র দাবিদার মোটেই কমিউনিস্টরা নয়, তবুও গোয়েবল্‌স্ এর পদাঙ্ক অনুসরণকারী কমিউনিস্টরা বারবার এই মিথ্যা প্রচার করেই ক্ষমতায় এসেছে এবং আজও সেই কথাই বাজিয়ে চলেছে। কংগ্রেস কেন্দ্রের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে চিরকালই রাজ্যে সিপিএম /সি পি আইকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ওয়ার্ক ওভার দিয়ে গেছে। আজও দিচ্ছে। তাই রাজ্যের অর্থমন্ত্রী সি পি এম-র অসীম দাশগুপ্ত ২০০৪-০৫-এর বাজেট বিবৃতিতে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে কংগ্রেসী সদস্যদের সামনেই বলতে পারলেন যে তাদের 'কৃষক সংগ্রামের শক্তির ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে প্রশাসনিক উদ্যোগ এবং বিকেন্দ্রীকৃতভাবে পঞ্চায়েতের ভূমিকার কারণে ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে সমগ্র রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান হয়েছে সর্বপ্রথম।'

> **"পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টরা ৩২ বছর ক্ষমতায় থেকেও কৃষিতে বাণিজ্যকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রযুক্তিকরণ এবং বিপণনের সুস্থ প্রতিযোগিতার কোনও ব্যবস্থাই গড়ে তোলেনি। এখনও এখানকার আলু চাষীরা ফলন বেশি হলে চিন্তায় পড়ে। ফোড়েরা সময় মতো আলু না কিনে আলু অস্বাভাবিক কম দামে বিক্রি করতে চাষীকে বাধ্য করে। চাষী যখন উৎপাদন ব্যয়েরও কম দামে আলু বিক্রি করতে বাধ্য হয় তখন তারা আত্মহত্যা করে।"**

একথা সব সময়ই মনে রাখতে হবে যে, মুসলমানরা যেরকম যেকোনও অ-মুসলিম রাষ্ট্রকে 'দার-উল-হারব' অর্থাৎ 'শত্রুভূমি' বলে মনে করে থাকে, কমিউনিস্টরাও তেমনি কোনও অ-কমিউনিস্ট রাষ্ট্রকে বলে থাকে 'বুর্জোয়া' রাষ্ট্র। আর বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে উৎখাত করে নিজেরা ক্ষমতা দখল করে অ-কমিউনিস্টদের উপর দমন-পীড়ন চালানোটা তাদের কাছে এক পবিত্র কাজ। তাহলেই তাদের গুরুমশাই কার্ল-মার্কস তাদের ফুল মার্কস্ দেন। কারণ তিনিই তো তার আজকের শিষ্যদের শিখিয়ে গেছেন যে, এক শ্রেণীর দ্বারা আর এক শ্রেণীর উপর নির্যাতন চালাবার উৎপীড়ন চালাবার যন্ত্র হচ্ছে রাষ্ট্র।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টরাও প্রথমে ক্ষেত মজুরদের মধ্যে জমি পাইয়ে দেওয়ার লোভ জাগ্রত করে তাদের সংগঠিত করেছে। সংগঠন গড়েছে। পরে শ্রেণী বিদ্বেষ জাগ্রত করে গ্রাম্য জীবনে নিয়ে এসেছে বিভেদের রাজনীতি। ক্ষেত মজুরদের সঙ্গে মধ্যবিত্ত চাষী ও ধনী চাষীদের মধ্যে চিরাচরিত সুসম্পর্ক নষ্ট করে পার্টি সংগঠন মজবুত করেছে। সেই মজবুত পার্টি সংগঠনের চাপে আজ মধ্যবিত্ত ও ধনী চাষী তো বটেই, এমন কী জোতদাররাও পার্টি সদস্য হয়েছে অথবা তার ছত্রছায়ায় এসেছে। আগ্রাসী পার্টি সংগঠন আজ কৃষকদেরই জমি থেকে উচ্ছেদ করতে উদ্যত। শিল্পের নামে জোর করে জমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ করতে গিয়ে বাধা পেয়ে, একনায়কতন্ত্র বিশ্বাসী কমিউনিস্টরা ক্ষুধার্ত শৃগালে পরিণত হয়েছে। কৃষকদের জন্যে বিকল্প কর্মসংস্থানের সিদ্ধান্ত আসলে কৃষিকে ধ্বংস করে কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদ করার এক ধূর্ত পরিকল্পনা।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বৃটিশরা আসার আগে হিন্দুস্থানে ভূমির উপর মালিকানা ব্যাপারটি কৃষকদের জানা ছিল না। জমি ছিল সার্বজনীন। জমি চাষ করাই ছিল চাষীর কাজ। একটা অংশ শুধু দিতে হত রাজাকে, রাজ্য পরিচালনা এবং প্রজা রক্ষার কাজে। তাই জমি নিয়ে হানাহানি সংঘর্ষ যাকে কমিউনিস্টরা বলে কৃষক সংগ্রাম বা শ্রেণী সংগ্রাম, তা হিন্দুস্থানের কৃষকের কাছে ছিল একান্তই অজানা। ইংরেজরা এই দেশ দখল করতে এসে এ দেশের মানুষের প্রতিরোধের মুখে পড়েনি, পড়েছিল এ দেশের অচলায়তন সমাজের প্রতিরোধের মুখে। ইংরেজরা তাই প্রথমেই এই সমাজটাকেই ভাঙার কাজে হাত লাগায়। লর্ড কর্নওয়ালিসের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৯৩-এ ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত এক নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন। এই ব্যবস্থাই ইতিহাসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে

(এরপর ১৩ পাতায়)

বঞ্চিতদের বঞ্চ নাকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চ ল অবহেলিত থাকলেও বিন্দুমাত্র বিলাসিতায় ছেদ পড়েনি উত্তর-পূর্বাঞ্চ লের তথাকথিত রক্ষাকর্তা বলে পরিচিত কংগ্রেসী নেতাদের। ইংরাজী সাপ্তাহিক 'ইণ্ডি য়া টু-ডে'-র তথ্য অনুযায়ী, উত্তর-পূর্বাঞ্চ লের প্রতি অবহেলা বঞ্চ নার গান গেয়ে কোটিপতি হয়েছেন কংগ্রেসী এম এল এ, এম পি-রাও।

সূত্র অনুযায়ী, কংগ্রেস এম পি মণিকুমার সুব্বার সম্পত্তির পরিমাণ ১৭.১ কোটি টাকা। ডিমাপুরের কংগ্রেস বিধায়কের সম্পত্তির পরিমাণ ৪৬.১ কোটি টাকা। এন পি এফ এম এল এ নকলুটোসির সম্পত্তির পরিমাণ ৪১ কোটি টাকা। এ ইউ ডি এফ-এর বিধায়ক বদরুদ্দিন আজমলের সম্পত্তির পরিমাণ ১৪.২ কোটি টাকা। অরুণাচল প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গেগাং আপাং-এর সম্পত্তির পরিমাণ ৯.৪ কোটি টাকা। মেঘালয়ের ইউ ডি পি এম এল এ মেটভা লিংডোর সম্পত্তির পরিমাণ ১৬.১ কোটি টাকা। নাগাল্যাণ্ডে র বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নেফিউ রিও-র সম্পত্তির পরিমাণ ৬.২ কোটি টাকা। অরুণাচলের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী দর্জি খাণ্ডু র সম্পত্তির পরিমাণ ৪.২ কোটি টাকা। অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ-এর অর্থের পরিমাণ ৯৭ লক্ষ টাকা।

বিপজ্জনক মুর্শিদাবাদ সীমান্ত

(১ পাতার পর)

পারে তার জন্যই এই ব্যবস্থা। এলাকার মানুষের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে জঙ্গি সংগঠনগুলি নানা সংগঠনের মোড়কে এই সীমান্তে কাজ করছে। মাদ্রাসা ও মসজিদের প্রভাব থাকছে এদের। জঙ্গি টিমের মধ্যে তরুণদের সংখ্যা বাড়ছে। মহিলাদের উপস্থিতিও দেখা যাচ্ছে। মহিলাদের ব্যবহার করা হচ্ছে মূলত টিমের উপর ছদ্মবেশী পারিবারিক মোড়ক লাগানোর জন্য।

বস্তুত পশ্চি মবঙ্গ তথা ভারত থেকে মুর্শিদাবাদকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা আজকের নয়, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকেই এই প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। ওই সময় সর্বভারতীয় বা রাজ্যস্তরের মুসলিম লীগ নেতৃত্ব মুসলিমদের বিভিন্ন সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে হিন্দুবিরোধী জেহাদ তুলে তাদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। তার ঢেউ মুর্শিদাবাদ জেলাতেও এসে পৌঁছেছিল। এই জেলা নিঃসন্দেহে রাজ্য মুসলিম লীগের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৯৩০ এবং ৪০-এর দশকে বঙ্গীয় বিধান পরিষদ ও বঙ্গীয় বিধানসভার বিভিন্ন নির্বাচনে দেখা যায় যে মুর্শিদাবাদ জেলার জাতীয়তাবাদী বা নির্দল মুসলিম প্রার্থীদের পরাজিত করে বেশিরভাগ সময়ই মুসলিম লীগ প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন। কেবল ১৯২৯ সালে মৌলবি আবদুস সামাজ (কংগ্রেস) এবং ১৯৪৬ সালে মহম্মদ খোদাবক্স (নির্দল) জয়লাভ করেছিলেন, মুসলিম লীগ প্রার্থীদের পরাজিত করে। ফরদাহ মুর্তাজা রেজা চৌধুরী, আবদুলবরী, সাহেবজাদা কাজেম আমিল মির্জা প্রমুখ মৌলবাদী নেতৃবৃন্দই বারবার জয়লাভ করেছেন।

জেলার মুসলিম লীগের সাংগঠনিক কার্যকলাপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলতে হয় যে, ১৯২৭ সালে এই জেলায় মুসলিম লীগের আনুষ্ঠানিক জন্ম হয়েছিল, কিন্তু সাংগঠনিক কাজকর্ম দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে ১৯৩০ সাল থেকে। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে বহরমপুর শহরের গোরাবাজার অঞ্চ লে কৃষ্ণনাথ কলেজের কুমার হোস্টেলের মাঠে মুসলিম লীগের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাদেশিক তথা সর্বভারতীয় লীগনেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন — উপস্থিত ছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না স্বয়ং। মহম্মদ আলি জিন্না তার ভাষণে বলেছিলেন — মুসলিম লীগের নিজস্ব একটি নীতি ও কর্মসূচী রয়েছে, তা হল মুর্শিদাবাদকে মুসলিম শাসনাধীনে প্রতিষ্ঠিত করা। ফলত এই ধরনের বক্তব্য দ্বারা প্ররোচিত হয়ে জেলার মুসলিম লীগ নেতৃত্ব জেলার বিভিন্ন প্রান্তে মাঝে মাঝেই কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও উত্তেজনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ ১৯২৪-২৫ সালে এবং ১৯৪২-৪৩ সালে প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে জঙ্গিপুর মহকুমার সুতী ও রঘুনাথগঞ্জ এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানো হয়। ১৯৪২-৪৩ সালের ঘটনায় জঙ্গিপুর মহকুমার তৎকালীন মহকুমাশাসক যিনি মুসলিম ছিলেন, স্বয়ং এই সাম্প্রদায়িক ঘটনায় উস্কানি দিয়েছিলেন — যা বঙ্গীয় বিধান সভার দুই মাননীয় সদস্য অতুল কুমার ও নবাবজাদা নাসারুল্লাকে নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে ধরা পড়ে। ১৯৮৮ সালের ২৪ জুনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও ছিল মুসলিম লীগের সেই ঐতিহ্যের প্রতিভূ। তবে আজ মুসলিমরা আর প্রকাশ্য দাঙ্গা করে না, আজ তারা প্রকাশ্যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানও করে না। আজ এই আক্রমণ চলে নীরবে। মুর্শিদাবাদ জেলা ভারতের প্রথম মুসলমান অধ্যুষিত জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯২১ সালের আদমসুমারি অনুসারে এই জেলার লোকসংখ্যা ১২,২৪,১৮৯ ছিল। ১৯৩১ সালে ১৩,৭০,৬৭৭, ১৯৪১ সালে ১৬,৪০,৫৩০ এবং ১৯৫১ সালে তা ছিল ১৭,১৫,৭৫৯। আজ তা বেড়ে কোথায় দাঁড়িয়েছে। আজ মুসলিম লীগের পরিবর্তে পুরো জেলাকে নিয়ন্ত্রণ করছে আই এস আই। এজন্য কাশ্মীর সীমান্তের মতোই এখানে চলছে অবৈধ কাজ-কারবার। অনুপ্রবেশের মতো এই সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে জাল টাকা এদেশে ঢুকছে। সীমান্ত এলাকার রানীনগর থানার বাহারুপাড়া বর্ডার আউটপোস্ট, লালগোলার খান্দুয়া বর্ডার আউটপোস্ট দিয়ে জাল নোটের পাচার সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে। সীমান্ত এলাকার রানীনগর, জলঙ্গী, বাহারপাড়া, রাজাপুর, ঘোষপাড়া, কাতলামারী প্রভৃতি এলাকা বাংলাদেশের সব থেকে কাছে। এইসব এলাকার অনেক জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া নেই। এই এলাকাকে পাচারকারীরা বেছে নিয়েছে চোরাচালানোর জন্য। লালগোলার কাটাখালি, কৃষ্ণমাল, রামনগর, তারানগর, দেশেয়ালিপাড়া, গাবতলা, পুরপুলিতলা, আড়িয়াদহ এলাকা দিয়ে চোরাইমাল পাচার হয়ে থাকে।

ভোটলোভী নেতাদের সহায়তায় মুসলিম মৌলবাদীরা তাদের লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছেতে পেরেছে। আগামী দিনে মুর্শিদাবাদ পশ্চি মবঙ্গে থাকবে কিনা সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

রাজ্যে মিড-ডে মিল

(১ পাতার পর)

১ম ও ২য় শ্রেণীতে ২০০৭ সালে যেখানে ৮৯.১ শতাংশ ছাত্রের অক্ষর জ্ঞান হয়েছিল, ২০০৮ সালে ওই সংখ্যা ৮৪.৮ শতাংশে নেমে গিয়েছে। ২০০৭ সালে ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যোগ বিয়োগ শিখেছিল ৭৫.৮ শতাংশ ছাত্র, ২০০৮ সালে ওই সংখ্যা নেমে হয়েছে ৫৫.৫ শতাংশে। অথচ সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পে শিশুদের শিক্ষা খাতে কেন্দ্রীয় অনুদান প্রাপকের তালিকায় পশ্চি মবঙ্গের স্থান ছিল পঞ্চ ম। তবুও প্রাথমিক শিক্ষায় সর্বস্তরে পশ্চি মবঙ্গ পিছিয়ে পড়েছে। অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তির জাতীয় গড় ৯৪.৯২ শতাংশ আর পশ্চি মবঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে ৯০.১০ শতাংশে।

৪০০০ বাংলাদেশী বন্দী

(১ পাতার পর)

ব্যবস্থা রাজ্য সরকারকে বহন করতে হচ্ছে। টাকার অঙ্কে তার পরিমাণও কম নয়। সরকারি সূত্রের খবর, আইনি পথে বাংলাদেশ অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত না নেওয়ায় এবার তাদের খেদিয়ে (পুশ-ব্যাক) সীমান্ত পার করে দেওয়া হবে বলে সিদ্ধা ন্ত নিয়েছে স্বরাষ্ট্রদপ্তর। এ পর্যন্ত ১৫০ জনকে এভাবে খেদিয়ে সীমান্ত পার করেও দেওয়া হয়েছে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, দমদম, কৃষ্ণনগর, প্রেসিডেন্সি, বালুরঘাট, বহরমপুর, ইসলামপুর এবং দিনহাটা জেলে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশী আটক রয়েছে। এরমধ্যে ১৫০০ বন্দির সাজার মেয়াদ খাটা হয়ে গিয়েছে। ১৪০০ বাংলাদেশীর বিরুদ্ধে মামলা চলছে। এক হাজার বন্দি সাজা খাটছে। জেলে প্রায় ৩০০ শিশু অনুপ্রবেশের দায়ে বন্দি রয়েছে। প্রায় ৬০০ মহিলাও সীমান্ত পেরিয়ে এরাজ্যে ঢোকার সময় পুলিশ এবং বিএস এফের হাতে ধরা পড়ে এখন জেলেবন্দি। বাংলাদেশে হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগের সরকার আসার পর অবশ্য অনুপ্রবেশকারীদের ফেরানোর একটা চেষ্টা শুরু হয়েছে। কিন্তু তা কতদিনে সফল হবে তার উত্তর নেই।

রাজ্য রাজনীতি

লোকসভা নির্বাচনে প্রাক্‌-রাজনীতির খেলা চলছে

নিশাকর সোম

"রাজনীতি বড় জটিল।" একটি নাটকের এক কূটনৈতিকের বিলাপ। আবার জোয়াড লিখলেন — "পলিটিক্স ইজ দ্য লাস্ট রিসোর্ট অফ দ্য রাস্কেল।" এই কথা রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করার সময় বলেছিলেন। বোধ হয় স্বগতোক্তি!

যা'হোক, লোকসভা নির্বাচন নিয়ে রাজ্যের সব দলই প্রস্তুতি পর্বে আছে। প্রথমে দেখা যাক সিপিএম-এর অবস্থা। খুব করে সংবাদমাধ্যমে জানান দিল রাজ্য সিপিএম নেতৃত্ব যে, এবার বহু তরুণ এবং নতুন মুখ তাঁদের তালিকায় দেখা যাবে। আমি জোর দিয়ে বলছি, সিপিএম নদীয়া জেলা ছাড়া আর কোনও জেলায় বড়সড় কোনও পরিবর্তন করছে না। তা'হলে পার্টির মধ্যে অন্তর্বিপ্লব দেখা যাবে। তাই লক্ষ্মণ শেঠ থাকবেন, থাকবেন অমিতাভ নন্দী, তড়িৎবরণ তোপদার।

রাজ্য সিপিএম নেতৃত্বের সামনে কঠিন বাস্তব হল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে কাজে নামানো। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী, রাজ্য কমিটি এবং প্রতিটি জেলায় ভোজনে তৃপ্ত আর ভুখা গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব। "তুমি রইবে তেতলার পরে/ আমি রইবো নীচে / তবুও তোমারে দেবতা মানিব/ সে ভরসা আজিকে মিছে।"

হুগলী জেলার অবস্থা শোচনীয় — একটি কেন্দ্রও নিরাপদ নয়। মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণাতেও দোদুল্যমান অবস্থা।

এমতাবস্থায় মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রী বনাম "শ্রীকৃষ্ণ" ভক্ত সুভাষ চক্রবর্তীর সঙ্গে বিতণ্ডা হয়েছে। সুভাষবাবুর বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী বড় বেশি পুলিশ আমলা নির্ভর হয়ে পড়ছেন। তাই পুলিশদের যত রকম সুবিধা দিচ্ছেন। বিতর্কিত পুলিশ কর্তা প্রসুন মুখার্জিকে বুদ্ধ বাবু একাই সমর্থন করে গেলেন। বুদ্ধ বাবু বড়ই ইগোতে ভোগেন। তাই তো অশক্ত অসুস্থ অতিবৃদ্ধ জ্যোতি বসু রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় উপস্থিত হয়ে বলেছেন, নেতাদের এক হয়ে চলতে হবে। তবেই সমগ্র পার্টি এক হবে। তিনি সুভাষবাবুকেও বলেছেন, কোনও বিতর্কমূলক কথা পার্টিতে এবং বাইরে না বলতে।

সুভাষবাবুও ইগো-তে ভোগেন। তাই তিনি বলেন, "আমিই শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী।" ট্রামবাসে লোকে কিন্তু সুভাষবাবু বাস-মালিকদের মুখপাত্র বলে অভিহিত করেন। কিছু লোক তো তাঁকে তীব্র সমালোচনা করে থাকেন। কিছু লোক বলে থাকেন সুভাষবাবু নাকি একটি নিজস্ব গোষ্ঠী — কক্‌স দ্বারা পরিচালিত হন। সুভাষবাবু তাঁর জায়াকে প্রচারের সামনে এনে দিচ্ছেন। একটি এনজিও-এর সভানেত্রী হিসাবে রাস্তার মোড়ে তোরণে নাম ঘোষিত হয়েছে। শুধু সুভাষ চক্রবর্তী নন — হাওড়া জেলাতে সকল নেতার স্ত্রী-কন্যা-পুত্রবধূকে কাউন্সিলার করা হয়েছে। আমি আগেই লিখেছিলাম সিপিএম-নেতারা স্বজন পোষণে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট। নীচের তলার গরীব-দুঃখী কমরেডদের দেখাও ছেড়ে দিয়েছেন। এঁদের মনোভাবটা হল "লুঠে নে ক'দিন বইতো নয়।" সিপিএম-এর যখন এই অবস্থা, বলাবাহুল্য আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক ও সিপিআইতে আরও সঙ্গীন অবস্থা। ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী মনোনয়নের দায়িত্ব সুপ্রিমো অশোক ঘোষের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ তীব্র দলাদলি। আর এস পি তে দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় কোণঠাসা। সিপিআই যেমন খুশী সাজো।

> "সিপিএম-নেতারা স্বজন পোষণে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট। নীচের তলার গরীব-দুঃখী কমরেডদের দেখাও ছেড়ে দিয়েছেন। এঁদের মনোভাবটা হল "লুঠে নে ক'দিন বইতো নয়।" সিপিএম-এর যখন এই অবস্থা, বলাবাহুল্য আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক ও সিপিআইতে আরও সঙ্গীন অবস্থা।"

বামফ্রন্টের এই অবস্থায় বিরোধীদের সার্বিক ঐক্যই বিকল্প হতে পারে। কিন্তু তা হল না — নেতা-নেত্রীদের ইগো'র জন্য। তৃণমূল আর কংগ্রেসের দড়ি টানাটানি চলছে। শর্ত পাল্টা শর্তের লড়াই চলছে। বিজেপি-র বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ যে নেত্রী তোলেন — তিনি কিন্তু নমাজ পাঠ থেকে আরম্ভ করে মতুয়া এবং সর্বশেষে রবিদাস-দের মিছিলে অংশগ্রহণ করে ভোট ভিক্ষা করেছেন। এটা কি সাম্প্রদায়িকতা নয়?

তৃণমূলেও এক নেত্রীই সর্বেসর্বা। কারুর দাঁত ফোটানোর সাধ্য নেই। তিনিই শেষ কথা। তবে তিনি নিজের শক্তি নিয়ে মনে মনে চিন্তিত। তাই কংগ্রেসের আঁচল ধরার জন্য উদগ্রীব। তিনি এটা কি জানেন এবার লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতারাও সন্দিহান। লোকসভা নির্বাচনের পর একথা নিশ্চিত যে কংগ্রেস আবারও সিপিএম-এর ও অন্যান্যদের সাহায্য চাইবেই। তাই কংগ্রেস নেতৃত্ব শর্ত দিয়েছেন যে, নির্বাচনের পরও তৃণমূলকে কংগ্রেসের সঙ্গে থাকতে হবে।

লেখা শেষ করার সময় কাগজে পড়লাম যে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, পার্টি কর্মীরা গরীব মানুষের কাছে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। বুদ্ধ বাবু আপনি তো বহু গরীব মানুষের কথা কানেও নেন না। তাঁদের চিঠি আবর্জনার ঝুড়িতে নিক্ষিপ্ত হয়। এরকম ১১০টি অভিযোগ আমার হাতে আছে। যদি দাবি করা হয় তবে তাঁদের অনুমতি সাপেক্ষে পর্দা ফাঁস করে দেব। বুদ্ধ দেববাবু আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও। কাঁচের ঘরে বসে অন্যকে ঢিল ছোঁড়ার অভ্যাস ভাল নয়। আপনি আরও বড় ধাক্কা খেতে পারেন। সেদিন খুব দূরে নয়। যেভাবে জ্যোতি বসুকে সরানোর ব্যাপারে আপনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন ঠিক সেইভাবেই আপনাকেও একদিন সরানোর উদ্যোগ নেবেন সুভাষ চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং।

শুধু পুলিশবাহিনীকে তুষ্ট করা নয়। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেববাবু সরকারি কর্মচারীদের খুশি করার জন্য — বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, অস্থায়ীকে স্থায়ী করা প্রভৃতি ঘোষণা করেছেন। এরপর সরকারি কর্মচারীদের সিপিএম নিয়ন্ত্রিত সংগঠনের মারফৎ সরকারি কর্মচারিদের ডিউটি থেকে কামাই করিয়ে রাণীরাসমণি রোডে জমায়েত করানো হল। সেখানে বুদ্ধ বাবু সরকারি কর্মচারীদের পিঠ চাপড়ে বক্তৃতা করলেন। উদ্দেশ্য একটাই— অন্যান্য বারের মতোন এবারও যাতে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা নির্বাচনী জয়ের কৃত-কৌশলে সক্রিয় থাকেন। পুলিশ সরকারি কর্মচারী বুদ্ধ বাবুর পাশে।

অ ঢ রকম

শেষ চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। এখন কমপিউটারের যুগ। ইন্টারনেটের সময়। মাউস ক্লিক করে মুহূর্তের মধ্যে ই-মেল পাঠানোর যুগ। পোস্ট অফিসেও এসেছে বৈচিত্র্য। বসানো হয়েছে কমপিউটার। স্যাটেলাইটে পাঠানো হচ্ছে খবরা-খবর। ২৪ ঘন্টায় ডাক পৌঁছে দেবার জন্য রয়েছে স্পীড পোস্টের মতো ব্যবস্থা। এই বৈচিত্র্যর মাঝে তাই সুকান্ত ভট্টাচার্যের রাণারের ছবি কারও মনে ভেসে আসে না। দেখতে পাওয়া যায় না তারাশঙ্করের দীনু হরকরাকে। খুঁজে পাওয়া যায় না দীনু হরকরা, রাণারের সেই ব্যস্ততা। ভারতীয় ডাক ব্যবস্থার এখন বর্ণালী দিন। ডাক নিয়ে যাওয়ার পুরনো পদ্ধতি অতীত। তবুও প্রযুক্তির ভিড়ে আজও এখানে ঘোড়ায় করে ডাক যায়। ডাক আসে। রাণার পদ ভারতীয় ডাক ব্যবস্থা থেকে মুছে না গেলেও, ঘোড়ায় করে ডাক নিয়ে যাওয়ার এই চল ভারতের অন্য কোথাও নেই। সম্ভবত বিশ্বেও না।

ওড়িশার জেইপুর শহর। ঘোড়ার খট খট আওয়াজে বোঝা যায়, ডাক আসা-যাওয়ার সন্দেশ। ঘোড়ার গাড়িতেই পোস্ট অফিস থেকে ডাক নিয়ে যায় স্থানীয় যুবক পদুস্ত। পৌঁছে দেয় এক পোস্ট অফিস থেকে অন্য পোস্ট অফিসে। পদুস্ত এই পেশায় নতুন। তবে তার কাছে এই কাজ কর্ম নয়, ধর্ম। সে নিজেও এই দায়িত্ব পেয়ে খুশী। কাঠের তৈরি গাড়িটিতে বোঝাই থাকে দেশ-বিদেশের চিঠিপত্র।

ডাকের বোঝার মাঝে দিব্যি নিজের বসার একটা জায়গা করে নেয় সে। ঘোড়াটাও জানে তাকে কখন, কীভাবে, কোথায় যেতে হবে। সেও যেন ভারতীয় ডাক বিভাগের একনিষ্ঠ কর্মী। কর্তব্যপরায়ণ চাকরিজীবী।

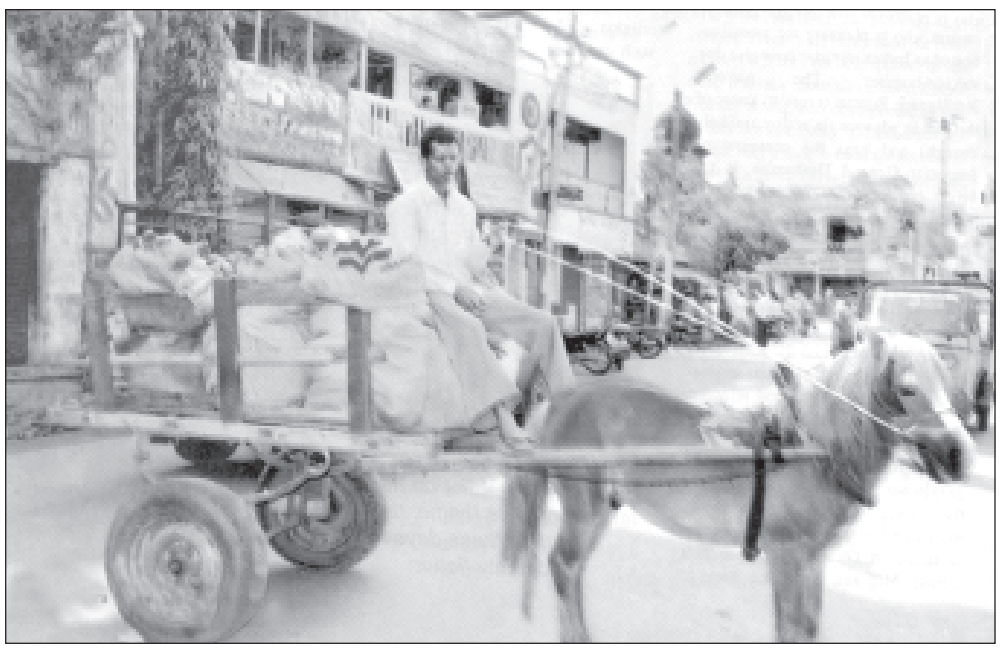

পদুস্তর আগে একাজের দায়িত্ব ছিল তার বাবা নীলার হাতে। তাঁরও আগে এই পদের দায়িত্বে ছিলেন তাঁর ঠাকুরদাদা। ১৯২০ সাল থেকে বংশ পরম্পরায় পদুস্তরাই এই গুরু দায়িত্ব পালন করে আসছে। একাজে উপার্জন কম। নীলাবাবু বেতন পেতেন দৈনিক ৫০ টাকা। তার ওপর ছিল ঘোড়ার জন্য খরচ। যা বাঁচতো তাতে কোনওমতে সংসার চলতো। পদুস্ত তার বাবার থেকে বেশি পায়। তাও অনিল ধীরের দাক্ষিণ্য। অনিল ধীর তাদের এই দুর্দশার চিত্র তুলে ধরে এক তথ্য সমৃদ্ধ ছবি তৈরি করে। 'দ্য লাস্ট পোস্ট' সিনেমাটা দেখেই হুঁস ফেরে কর্তৃপক্ষের। বেতন বাড়িয়ে দৈনিক ১৫০ টাকা করে ডাক বিভাগ। পদুস্তর স্ত্রীও পোস্ট অফিসের সঙ্গে যুক্ত। সে জল সরবরাহ করে। ওড়িশায় জেইপুর শহরে যানবাহনের অভাব নেই। আধুনিক প্রযুক্তিও আছে।

এত সবের মাঝেও ঘোড়ায় ডাক নিয়ে যাওয়া যেন এক অন্য মাত্রা যোগ করেছে শহরে। এ যেন জেইপুরের আর এক ঐতিহ্য।

এভাবেই ডাক নিয়ে যাওয়া হয়।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল

মণিপুরের মতো এত বেশি জঙ্গি গোষ্ঠী কাশ্মীর ছাড়া অন্য কোনও রাজ্যে নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সেই ১৯৯৩ সাল থেকেই মণিপুর পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই-র অন্যতম লক্ষ্যস্থল। ১৯৯৩-এর মার্চে মুম্বাই বিস্ফোরণের ঘটনা সবার জানা, কিন্তু ওই বছরের মে মাসে মণিপুরের থৌবাল জেলায় যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়, তাতে ১৫০ জন মণিপুরী মারা গিয়েছিল। এ খবর কিন্তু অনেকেই জানেন না। লড়াইটা বেঁধেছিল মৈতেয়ী মণিপুরীদের (হিন্দু) সঙ্গে মণিপুরী মুসলমানদের। মণিপুরী মুসলমানদের উত্তর-পূর্বাঞ্চ লে পাঙ্গাল বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। মৈতেয়ী মণিপুরী এবং পাঙ্গাল (মুসলমান) মণিপুরীদের দুই উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর তোলা আদায়ের বখরা ও এলাকায় নিয়ে দাঙ্গা বেঁধেছিল এবং সেই দাঙ্গা ইম্ফল জেলাতেও ছড়িয়েছিল। ঘটনা হল, মণিপুরে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় অনেকগুলি ইসলামি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী রয়েছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী পীপুলস্ ইউনাইটেড লিবারেশন্ ফ্রন্ট (পি ইউ এল এফ)। মণিপুরের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এদের কাজকর্ম ছড়িয়ে রয়েছে। থৌবাল জেলার লাইলং বাজারে তোলা আদায় নিয়ে প্রথম গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়েছিল। সংখ্যালঘু মুসলমান জনগোষ্ঠীর আধিপত্য এবং নিরাপত্তা বজায় রাখাটা পালফ্ জঙ্গিগোষ্ঠীর প্রাথমিক কর্মসূচী। এর সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন ইসলামি জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা বজায় রেখে সশস্ত্র সন্ত্রাসের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চ লে এক ইসলামিস্তান গঠনের মতো দূরগামী ও বৃহত্তর লক্ষ্য। এরা মণিপুরে মুসলমান বালিকাদের জন্য পোশাক বিধি ছড্ডক্তজন্দ্বব্দব্দ ট্রপ্সস্তুন্দ্বগ্ন এবং এ্যালকোহল বর্জনের ফতোয়া দেয়।

ভারতবর্ষে বোধহয় মণিপুর একমাত্র রাজ্য, যেখানে প্রচুর সংখ্যায় উগ্রপন্থীগোষ্ঠী রয়েছে। কাশ্মীর ও অসমকে বাদ দিলে একটিমাত্র রাজ্যে এত বেশি সক্রিয় জঙ্গি গোষ্ঠী বোধহয় ভারতের অন্য কোনও রাজ্যে নেই। ২০০৮-এ মণিপুর জঙ্গিদের দাপাদাপি ব্যাপকভাবে দেখা গেছে। মণিপুরে দীর্ঘদিন ধরে মোতায়েন রয়েছে প্রচুর নিরাপত্তারক্ষী। লাগু আছে সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ অধিকার আইনও। মাঝে মাঝেই আর্মড্ ফোর্সেস্ স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনও হয়। তবে গত বছরের ২৬।১১ তে মুম্বাইয়ে পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদীদের হামলার পরিপ্রেক্ষিতে নতুনভাবে কেন্দ্রকেও মণিপুরে নজর দিতে হবে।

শিলচরে সেনাবাহিনীর হাতে ধৃত পালফ্ জঙ্গি আনোয়ার হুসেন।

গত বছর ৩০ ডিসেম্বর কাকভোরে সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চ লের ৫৭ নং মাউন্টেন ডিভিশন এবং বিষেণপুর জেলা পুলিশ যৌথভাবে কে ওয়াই কে এল জঙ্গিদের ৬টি শিবির মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার ধবংস করে দেয়। বাজেয়াপ্ত হয় দুটি একে ৫৬ সিরিজের রাইফেল, ১২টি ম্যাগাজিন, প্রচুর গোলাগুলি, ইউ বি জি এল গ্রেনেড, ১৫ টি চীনে তৈরি ল্যাণ্ডমাইন, আট সেট সেনা পোশাক, একটি টেলিভিশন, একটি জেনারেটর, ৬টি গ্যাস সিলিণ্ডার, আই ই ডি বিস্ফোরক, প্রচারপত্র, সি ডি সহ যুদ্ধ করার উপযোগী যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম। কে ওয়াই কে এল-এর এই শিবিরগুলির অবস্থান ছিল লোকটক লেকের গায়ে এর সরু জলার ধারে। এমন জায়গায় কুঁড়ে ঘর টাইপের ওই শিবিরগুলি ছিল যে, বাইরে থেকে বোঝা প্রায় অসম্ভব। প্রবেশ পথও খুব সংকীর্ণ। স্থানীয় গ্রামবাসীরা চাঁদার জুলুমে অতিষ্ঠ হয়ে ওই শিবিরের খবর জানিয়ে দিয়েছিল। এবছরের ২ জানুয়ারি মণিপুরের ইরিলবাগ থানার মকহং গ্রামে ১৪ বছরের এক মুসলমান কিশোর খুন হয়ে যায়। প্রতিবাদে শতাধিক উন্মত্ত মুসলমান জনতা থানা ঘেরাও করে পাথর ছুঁড়তে থাকে। পুলিশ উন্মত্ত জনতাকে বাগে আনতে বাধ্য হয়ে কাঁদানো গ্যাস ও রবার সেল ফাটায়। ৬ জন আহত হয়। হত্যার বিরুদ্ধে গঠিত অ্যাকশন কমিটি মুখ্যমন্ত্রী ইবোবি সিং-এর সঙ্গে দেখা করে। তারা মুখ্যমন্ত্রীকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে দোষীদের গ্রেপ্তার করার চূড়ান্ত সময়সীমা ধার্য করে দেয়। অন্যথায় মুসলমান এলাকায় বিক্ষোভ আন্দোলনের হুমকি দেয়। সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারই দায়ী থাকবে বলে তারা হুমকি দেয়।

অসমসহ পূর্বাঞ্চ লে আই এস আই-এর নেটওয়ার্ক চালু হতেই উলফা নেতারা বাংলাদেশে ঘাঁটি গাড়ে। নববই-এর দশক থেকে উলফার শীর্ষ নেতাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশ। ১৯৯২ ডিসেম্বর-এ অসমে সাম্প্রদায়িক গোলমাল এবং ১৯৯৩-এ মণিপুরের তীব্র সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মূল কারিগরই ছিল আই এস আই। লাইলং-এর ওই সঙঘর্ষের পর মণিপুরের মৈতেয়ী গোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদীরা চীন ও মায়ানমারে যোগাযোগ করে। তারপরই তারা আই এস আই-এর উত্তর-পূর্বাঞ্চ লের নেটওয়ার্কের অঙ্গীভূত হয়।

পূর্বকথিত পালফ্ জঙ্গিরাও তাদের বিচরণ ক্ষেত্র বিস্তার করে অসমসহ অন্যান্য রাজ্যেও। তাদের যোগাযোগ হয় হরকত-উল-জিহাদ-ই-ইসলামি-র মতো জেহাদি জঙ্গিদের। পরে দশজন পালফ্ জঙ্গি ধরা পড়ে। চারজনকে ধরা হয় গুয়াহাটি থেকে। ওই চারজন মণিপুরে সেনাবাহিনীর কাছে ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ বলে পূর্বঘোষিত ছিল। বাদবাকী ৬ জনকে ধরা হয়েছিল ২০০৮-এর এপ্রিলে কর্ণাটকের মাইসোর হোটেল থেকে। তারা সকলেই এসেছিল মণিপুর থেকেই। তাদেরকে পরে সনাক্ত করে পরিচয় জানা যায়। থৌবাল জেলার কাকচিং থেকে জাকারিয়া খান, চানান গ্রামের আলতাফ্ এবং ফিরোজ খান (বিষেণপুর জেলা)-কে জিজ্ঞাসাবাদ ও তাদের স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ সন্ত্রাসবাদী নেতা ওমর ফারুখকে গুয়াহাটির পাথরকয়ারি থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়। ১৯৯৯-এর ২২ জুলাই আপার অসমের বরপেটা থেকেও বেশ কয়েকজন পালফ্ জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এ বছরের জানুয়ারিতে ইম্ফলস্থিত সেনাবাহিনীর অফিসাররা, বিষেণপুর জেলা পুলিশ এবং দিল্লীর স্পেশাল ব্রাঞ্চে র পুলিশ গুছিয়ে এক অভিযানে যায়। তাদের হাতে গ্রেপ্তার হয় দিল্লীতে কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকজন শীর্ষ নেতা। সেনাবাহিনীর ৫৭ নং মাউন্টেন ডিভিশনের পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ গোপন সংবাদ সরবরাহ করা হয়েছিল। ওই সব জঙ্গিরা ছিল কে সি পি-র মানগং এবং লামফেল গোষ্ঠীর। তাদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি হত্যা, বোমাবাজি, অপহরণ এবং মণিপুরে তোলা আদায়ের অভিযোগ ছিল। আই এস আই-এর মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চ লে ভারত বিরোধী জঙ্গিগোষ্ঠী গঠন ও তাদের পালন পোষণ ও সবরকম সাহায্য দিয়ে চলে পাকিস্তান। ভারত নরম মনোভাবাপন্ন রাষ্ট্র হওয়ার কারণেই ভারতের বুকে পাকিস্তান এরকম জঘন্য কাজ চালিয়ে যেতে পারছে। ভারতের মনোভাব বদল না হলে সন্ত্রাসবাদীদের ঠেকানো সম্ভব হবে না।

আলুতে ধসা, উত্তরবঙ্গে চাষীদের মাথায় হাত

মহাবীর প্রসাদ টোডি ।। উত্তরবঙ্গে আলুচাষে ধসা রোগের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা উত্তর দিনাজপুর জেলার। কৃষি-দপ্তর সূত্রে জানা গেছে যে, জেলাতে প্রায় ৭০ শতাংশ আলুতে রোগ ধরেছে। উত্তরবঙ্গের আলু ভাণ্ডার বলে পরিচিত জলপাইগুড়ির পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। কৃষি দপ্তর জানিয়েছে, প্রায় ৪০ শতাংশ আলুতে ধসার সক্রমণ ধরেছে।

উল্লেখ্য যে, উত্তর দিনাজপুর জেলায় আলু চাষীর সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। এ বছর জেলার প্রায় ২০ হাজার হেক্টর জমিতে আলুর চাষ হয়েছে। জেলার ইসলামপুর, চোপড়া, গোয়ালপোখর ১ নং এবং ২ নং ব্লকসহ হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ ও রায়গঞ্জ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় আলু চাষ হয়। গত বছর আশাতীত ফলন হওয়ায় জেলার আলু চাষীরা সঙ্কটের মুখে পড়েন। বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ও হিমঘরগুলির অতিরিক্ত মুনাফা লাভের চেষ্টা নিয়ে বিভিন্ন ব্লকে আন্দোলনও হয়। গত বারের আর্থিক ক্ষতি সামলে উঠতে চাষিরা এবার প্রথম থেকেই সতর্ক ছিলেন। কিন্তু ঘন কুয়াশা ও স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ এবং মেঘলা আবহাওয়া আলু চাষে ধস নামিয়েছে।

জেলার চাষীদের অভিযোগ, কৃষি দপ্তরের উদাসীনতায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নিয়েছে। ইসলামপুর আলু চাষী সমিতির সম্পাদক নেপাল দত্ত বলেন যে, সময় থাকতে সঠিক ওষুধ ও সার নির্বাচন এবং প্রয়োগ নিয়ে কৃষি দপ্তর সক্রিয় হলে পরিস্থিতি এমন হতো না। আমরা লিখিতভাবে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছি।

এদিকে উত্তর দিনাজপুরের মুখ্য কৃষি আধিকারিক বলাই চাঁদ চক্রবর্তী বলেন যে, সমস্ত ফসল ওঠার পর ক্ষতিপূরণের বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে যাঁদের কৃষি বিমা করা নেই তাঁদের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের কোনও প্রশ্নই নেই।

তথ্যাভিজ্ঞ মহল এ অভিমত প্রকাশ করেছে যে, এ জেলাসহ ধসা রোগে আলুর ফলন মার খেয়েছে প্রায় সমস্ত উত্তরবঙ্গেই। অনেকে আবার ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে আলু চাষ করে সর্বস্বান্ত হওয়ার মুখে। তাই কৃষিদপ্তরের থেকে চাষীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেছে।

বরাকে জাল নোট চক্র সক্রিয়

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। অসমের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বরাক উপত্যকাতেও মুসলিম যুবকদের মাধ্যমে জাল নোট ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে একটা বেপরোয় ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সম্প্রতি ব্যাপক পরিমাণ জালনোটসহ দুই মুসলমান যুবক সেনাবাহিনীর ৭২ নং ফিল্ড রেজিমেন্টের হাতে ধরা পড়েছে। শিলচর থেকে বিশ্বস্ত সূত্রে এখবর পাওয়া গিয়েছে। ধৃতদের নাম হালিমুদ্দিন বড়ভুঁইয়া এবং জাফর হুসেন চৌধুরী। বয়স যথাক্রমে ২৩ ও ২৪ বছর। সেনাবাহিনীর সূত্রে জানা গিয়েছে, বরাক ভ্যালি জাল নোটের কারবারের নিরাপদ ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।

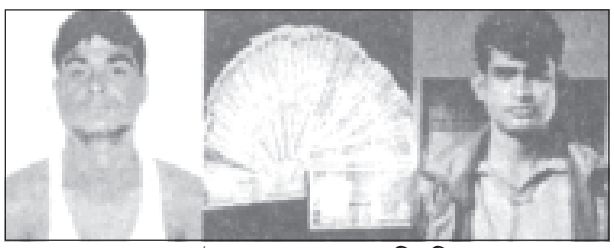

জাল নোট সহ ধৃত জাফর ও হালিমুদ্দিন।

হালিমুদ্দিন জেরার মুখে জানিয়েছে যে তাদের জাল নোট র‍্যাকেটের মূল মাথা হাইলাকান্দির এক বাসিন্দা। সেই তাদেরকে জাল নোট সরবরাহ নিয়ে মদত দিচ্ছে। তবে সেনা ও পুলিশ দফায় দফায় জেরা করেও তার নাম কবুল করাতে পারেনি। জাফর র‍্যাকেটের এক ভগ্নাংশ মাত্র। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, সেনা ও পুলিশ চেষ্টা-চরিত্র করে দুস্কৃতীদের ধরলেও তারা সহজেই কোর্ট থেকে জামিন পেয়ে যাচ্ছে এবং ফিরেই আবার কাজ শুরু করে দিচ্ছে। কয়েক মাস আগে এরকম এক দুর্দ্ধষ দুস্কৃতী হাইলাকান্দি জেলার কাটলিছড়াতে নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে নিহত হয়েছিল। এর পরেও জাল নোট ছড়ানোর কাজ যে থেমে নেই, জাফর ও হালিমুদ্দিনের গ্রেপ্তারই তার প্রমাণ।

বি এস এফ ক্যাম্পে যোগশিবির

তরুণ কুমার পণ্ডিত ।। মালদা জেলায় বি এস এফ জওয়ানদের মানসিক চাপ কমাতে যোগ শিবিরের আয়োজন করেছিল বি এস এফ কর্তৃপক্ষ। গত সপ্তাহে মালদা জেলার পুরাতন মালদা ব্লকের নারায়ণপুর ক্যাম্পে এই ধরনের একটি যোগ শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই শিবির নিয়ে জওয়ানদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ডিউটি করতে গিয়ে প্রচন্ড মানসিক চাপের মধ্যে পড়ছেন বি এস এফ জওয়ানরা। তাদের ২৪ ঘন্টায় ১০-১২ ঘন্টা ডিউটি করতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে পরিবারের বাইরে থেকে সীমান্তে কাজ করে এই সব জওয়ানরা মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এই সব জওয়ানদের মানসিক প্রফুল্লতা বজায় রাখতেই এই ধরনের যোগ শিবির করার ব্যবস্থা হয়েছে বলে বি এস এফের মালদহ রেঞ্জের ডি আই জি প্রভাত সিং টোমার জানান। এই শিবিরে বিভিন্ন ব্যাটেলিয়ানের ৫০০ জন জওয়ান যোগ দিয়েছিলেন। বাবা রামদেবের অন্যতম শিষ্য ননীগোপাল দেব এর তত্ত্বাবধানে জওয়ানরা প্রাণায়াম ও যোগাসনে অংশ গ্রহণ করেন। পরে তারা ভজনেও অংশ নেন। শিবিরে অংশ নিয়ে জওয়ানরা খুশি।

উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও এই ধরনের যোগ শিবির করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বি এস এফের অফিসাররা। তাদের কথায়, এই ধরনের শিবির যত বেশি হবে তত জওয়ানরা উপকৃত হবে। যোগ শিক্ষক ননীবাবু বলেন, বি এস এফের জওয়ানরা দেশের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন। তাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থ থাকা অত্যন্ত জরুরি এবং এই যোগ শিবির তাদের প্রভূত সাহায্য করবে।

মাওবাদী বন্দুক নয়, শিল্পই বস্তারের ভবিষ্যৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ছত্তিশগড়ের বস্তার। দেশের দক্ষিণ-পূর্বের এই জেলা প্রায়শই সংবাদ শিরোনামে থাকে। অন্যতম কারণ মাওবাদী কার্যকলাপ। এবারে একেবারে উল্টো পুরাণ! বস্তারের যুবসমাজ স্বীকার করেছে বন্দুকের নলের মুখে পরিবর্তন সম্ভব নয়। বস্তারের মতো চরম মাওবাদী অধ্যুষিত অঞ্চ ল এখন শিল্পের দিকে মুখ ফেরাচ্ছে। বস্তারের স্থানীয় মানুষের ইতিবাচক ডাকে সাড়া দিয়ে সম্প্রতি ছয় ছয়টি বড় অঙ্কের প্রোজেক্ট নিয়ে এগিয়ে এসেছে টাটা স্টীল, এসার স্টীল, এন এম ডি সি'র মতো উঁচুমানের কোম্পানীগুলো।

আশার কথা শুনিয়ে কোম্পানীগুলো বলেছে, প্রাথমিক ভাবে টাটা, এসারও এবং এন এম ডি সি মিলে প্রায় ২৫,০০০ চাকরির সংস্থান করতে পারবে। টাটা স্টীল লোহান্ডিগুড়াতে আনুমানিক দশ হাজার কোটির প্রোজেক্টের কথা বলেছে, যা কিনা ১০,০০০ হাজারের কর্মসংস্থান দেবে। এসার গ্রুপের ৩.২ মিলিয়ন টন উৎপাদন ক্ষমতার কারখানা হবে কিরানডুলে। অন্যদিকে এন এম ডি সি তার ইন্টিগ্রেটেড স্টীল প্ল্যান্টে ১৩ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ নিয়ে এগিয়ে আসছে। সরকার অবশ্য সাবধানেই পা ফেলছে। কারণ মাওবাদীরা এমন প্রচার করছে যে শিল্পায়ন সাধারণ মানুষকে ঘরছাড়া করবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'আমরা আম-জনতার কাছে সুষ্ঠু জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় জন্য দায়বদ্ধ। জমি অধিগ্রহণের সময় উপযুক্ত পুনর্বাসন ও স্থানীয়দের চাকরি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের দিকে নজর দেওয়া হবে।

মাওবাদীরা শুরু থেকেই শিল্পায়নের বিরোধিতা করে এলেও, যুবসমাজ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় শিল্পের দিকেই ফিরছে। খামু নামে লোহান ডিগুড়ার এক যুবক বলেছে, 'যুবকেরা চাকরি চাইছে সুস্থ ও সৎ জীবন যাপনের জন্য। বেকারত্বের সমস্যা এক অন্য মোড় নিতে পারে, যদি বস্তারে বড় বড় শিল্পগোষ্ঠী এগিয়ে আসে।' স্থানীয় যুবকরা আরও বলেছে, একবার শিল্পায়ন ঘটলে অর্থনীতির আমূল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর চাকরির সংস্থানও খুব স্পষ্ট। অন্যদিকে রাজ্য সরকার মনে করছে চাকরীর সংস্থানের সঙ্গে মাওবাদী প্রভাবও সঙ্কুচিত হতে শুরু করবে। শিল্প কারখানাগুলো একবার বেড়ে উঠতে শুরু করলে স্থানীয় শিক্ষা, সমাজ, আর্থ-সামাজিক সমস্ত দিকেই পরিবর্তন আসবে বলে মনে করছে নগরনারের রাজকমল, মহেন্দ্র, গোবর্ধনরা।

বস্তুত, ২০০৫-এর জুনে সালওয়া জুডুমের ব্যাপক জনপ্রিয়তার পর থেকে স্থানীয় যুবসমাজ এই এলাকাতে এক পরিবর্তনের দাবিতে উঠে পড়ে লেগেছে। ওরা শিল্পায়নকে অস্ত্র করেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ণের সাথে তাল মিলিয়ে তাদের জনজাতি সংস্কৃতিও রক্ষা হবে।

টাটা তাদের প্রোজেক্টের জন্য সরকারি মালিকানার ১৭০ হেক্টর ও বেসরকারি মালিকদের কাছ থেকে ১,৭৬৪.৬০ হেক্টর জমি নিয়ে কাজ শুরু করার প্রস্তাব পেশ করেছে। ক্ষতিপূরণের তালিকায় থাকছে প্রতি একরের জন্য দু'লক্ষ টাকা। মোট প্রায় ৭০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে ১,৭০৭ জন চাষীকে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এসার ও এন এম ডি সিও তাদের নেওয়া জমির বদলে টাকা এবং পরিবার পিছু একজনকে চাকরি দেওয়ার কথা ভাবছে বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানানো হয়েছে। বিজাপুর, দান্তেওয়াড়া, বস্তার, কাঙ্কের, নারায়ণপুর এই সমস্ত জেলাগুলিতে বামপন্থী উগ্রবাদী সংগঠন প্রায় তিন দশক ধরে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে আসছে। তাই স্থানীয় মানুষ বিশেষ করে যুবসমাজ যত শীঘ্র সম্ভব এই নৈরাজ্যের সুরাহা পেতে চেয়েছে। সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছে শিল্পায়ন এবং বিভিন্ন সরকারি পদক্ষেপ নিয়ে যাতে বস্তারের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করার কাজে লাগে। এখন সময়ের অপেক্ষা — মাওবাদ না শিল্পায়ন কোনটা উন্নত বাস্তার গড়ার পাথেয় হয়।

ছত্তিশগড়ে সন্ত্রাস দমনে নতুন নীতি

পুলিশই যাচ্ছে জনতার দ্বারে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ঘাসিরাম। বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ। সেদিন সে হঠাৎই দেখল তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একজন পুলিশ, হাতে একটা প্যাকেট। ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলার ওই প্রত্যন্ত গ্রামে গোণ্ড জনজাতিভুক্ত ঘাসিরামের ছিটেবেড়ার বাড়ির সামনে এক পুলিশকে দেখে ঘাসিরাম একটু ভয়ই পেল। গ্রামের অশিক্ষিত দরিদ্র মানুষ পুলিশকে ভয় পায়, এর আগে অনেককে মাওবাদীদের লিঙ্কম্যান বলে সন্দেহবশত পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছে। এবার কি তবে? না এবার তা হল না। উল্টে সেই পুলিশ ঘাসিরামকে প্যাকেটটা দিল। মিষ্টির প্যাকেট। জানা গেল, পরদিনও আর এক প্রতিবেশী গ্রামে এরকম কারও বাড়িতে উপহার নিয়ে পুলিশ দেখা করবে গরীব জনজাতি গৃহবাসীর সঙ্গে। পুলিশের এমন ব্যবহার তাক লাগিয়ে দিয়েছে গ্রামবাসীদের। বাত্তি গ্রামে ঘাসিরামকে যে মিস্টির প্যাকেট দিয়েছিল সেই পুলিশটির নাম স্বপন চৌধুরী। স্বপনবাবু স্থানীয় ধামতরি থানার ইনচার্জ। তিনিও ৫৮৭ জন জওয়ানের সঙ্গে সন্ত্রাস মোকাবিলার জন্য ৬ মাসের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

মাওবাদী সন্ত্রাস কবলিত নারায়ণপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুজিত কুমার আরও জানিয়েছেন, ট্রেনিং প্রাপ্ত জওয়ানরা জঙ্গল-মহলের গ্রামে গ্রামে জনসম্পর্কের জন্য যাচ্ছেন। স্থানীয় অধিবাসীদের, ছোটদেরকে-চকলেট, মিষ্টি, বিস্কুট এমনকী পড়াশোনার জন্য বই-খাতাও বিনামূল্যে সরবরাহ করছেন। গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাতেও সাহায্য করে যাচ্ছেন। কারও সরকারি অফিসে কোনও কাজ আটকে গেলে পুলিশই নিজেরা গিয়ে গ্রামবাসীদের সমস্যা দ্রুত সমাধান করে দিচ্ছে। গ্রামের প্রমুখদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে পুলিশ তাদের সমস্যার কথা জানছে। সাহায্য করছে। গ্রামবাসীদের নিয়ে মাঝে মধ্যে বৈঠক আলোচনাও চালাচ্ছে পুলিশ। সুজিত কুমারও ট্রেনিং নিয়েছেন।

রাজ্য পুলিশের অতিরিক্ত মহানির্দেশক পবন দেব জানিয়েছেন, একবার মাওবাদীদের গ্রামীণ নেটওয়ার্ক ভেঙে দিতে পারলেই সফল

রমণ সিং

হওয়া যাবে। মাওবাদী সন্ত্রাস কবলিত ছত্তিশগড় রাজ্য প্রশাসন মাওবাদীদের যোগাযোগের নেটওয়ার্ককে ভেঙে দিতে এই অভিনব কৌশল নিচ্ছে। তা হল প্রশাসনও প্রত্যন্ত গ্রামীণ জনসাধারণের সঙ্গে পাল্টা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য নানারকম চেষ্টা করছে। সরকার একাজে নিরাপত্তাবাহিনীর জন্য রীতিমতো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। মাওবাদী অধ্যুষিত কাঁকের জেলায় স্থাপিত হয়েছে — কাউন্টার টেররিজম্ অ্যাণ্ড জঙ্গল ওয়ারফেয়ার কলেজ (সি টি জে ডব্লিউ সি)। ২০০৫ সালেই মাওবাদী সন্ত্রাস মোকাবিলায় এই কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। ডিরেক্টর আছেন ৬০ বছর বয়স্ক ও সন্ত্রাস মোকাবিলায় সিদ্ধ হস্ত ব্রিগেডিয়ার বি কে পুনওয়ার। শ্রীপুনওয়ার ভারতের সেনাবাহিনীর জন্য একই ধরনের কলেজের ডিরেক্টর ছিলেন। সেনাবাহিনীর এই কলেজটি উত্তর-পূর্বাঞ্চ লের অসম-মিজোরাম সীমান্তে মিজোরামের বাইরেন্টিতে অবস্থিত।

নিরাপত্তাবাহিনীর দৃঢ় ধারণা গ্রামের লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে উঠলে মাওবাদীদের জঙ্গল এলাকায় সুব্যবস্থিত নেটওয়ার্ককে ভেঙে দিতে তারা সক্ষম হবেন। শ্রীপবন দেব জানিয়েছেন, একবার জঙ্গল এলাকার মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে পারলেই তাঁরা সফল হবেন। আবার ব্রিগেডিয়ার পুনওয়ার-এর মতে মাওবাদী প্রভাবিত প্রত্যন্ত গ্রামে স্থানীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন বেশ ব্যয়বহুল। এজন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থের যোগান নেই।

ছত্তিশগড়ে প্রত্যন্ত জঙ্গলমহলে অনুন্নয়ন মাওবাদী প্রভাব বিস্তারের অন্যতম কারণ। ২০০৪ থেকে সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে ১২৫০ জন মানুষ মারা গিয়েছেন। এবার পরিস্থিতি পরিবর্তনে সরকার বিকল্প পথ নিয়েছে, সাফল্য সময়ের অপেক্ষা।

সিস্টার জেসমে-এর আত্মজীবনী

নানদের নির্যাতন নিয়ে চার্চের মুখোশ খুলে দিল

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। কেরলের ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে যখন নানা অভিযোগ উঠেছে, তখনই এক প্রাক্তন নান আত্মজীবনী প্রকাশ করে চার্চের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। অনেকে নানদের জীবন নিয়ে অলীক গল্পে গা ভাসায়। তাদের জীবনযাত্রা নিয়েও অনেক গুরুগম্ভীর কথাবার্তা বলেন। কিন্তু কেরলের এস টি মেরিস্ কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা ডঃ সিস্টার জেসমে তাঁর আত্মজীবনীতে তুলে ধরেছেন নানদের জীবনের অনেক অজানা দিক। "আমেন — অন অটোবাইওগ্রাফি অফ এ নান' নামে বইটি গত সপ্তাহেই প্রকাশিত হয়। তিনি তাঁর এই গ্রন্থে যথেষ্ট সাহসিকতার সঙ্গে নানদের অন্ধকার জীবনের কথা লিখেছেন। যদিও তাকে এই প্রতিবাদী ভূমিকার জন্য যথেষ্ট অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। গত আগস্ট মাসে তিনি তার সিস্টারের পদত্যাগ করে স্বেচ্ছা অবসর নিয়েছেন।

তিনি তাঁর গ্রন্থের শুরুতে তুলে ধরেছেন তাঁর প্রথম জীবনের কথা। যা আজ থেকে ৩০ বছর আগের ঘটনা। তিনি লিখেছেন, তাঁকে বাধ্য করা হয়েছিল অন্যান্য নানদের সঙ্গে সমকামী হতে। জেসমে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, যারা এতে রাজি হয়নি, তাদেরকে চার্চ কর্তৃপক্ষ অন্য সমকামীদের দৃশ্যগুলি দেখতে বাধ্য করে। এমনই বহু অন্ধকারের কথা তিনি তার পুস্তকে স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করেছেন। চার্চের ভিতর এমন যৌন নির্যাতন প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে সিস্টার জেসমে তাঁর

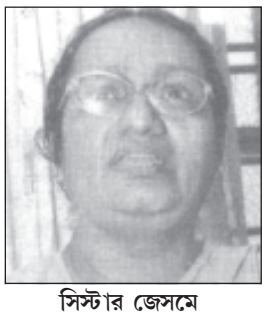

সিস্টার জেসমে

ব্যক্তিগত জীবনের একটা ঘটনা তুলে ধরেছেন। ইউ জি সি-র ইংরেজি কোর্সের এক অনুষ্ঠানে তাকে ব্যাঙ্গালোর যেতে হয়। জেসমের ইচ্ছা ছিল স্টেশনের ওয়েটিংরুমে থাকার। কিন্তু সিস্টাররা তাকে এক পাদ্রীর ঠিকানা দেয়। সেই পাদ্রী তাঁর জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা করতে থাকেন। এর পরের ঘটনা তিনি যা বলেছেন, তা অত্যন্ত রুচিহীন। তিনি বলেন, ওই পাদ্রী তাঁকে এক অন্যস্থানে নিয়ে যায়। সেখানে তিনি গাছের তলায় শুয়ে থাকা নারী-পুরুষকে আঙুল দিয়ে দেখান। এখানেই শেষ নয়। সেই পাদ্রী শারীরিক সম্পর্কের নানান কথা তাকে বলতে থাকেন। এগুলি তাদের শাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন।

চার্চের নিয়মনীতির কথা লিখতে গিয়ে শ্রীমতী জেসমে লিখেছেন, পাদ্রীরা নানদের সামান্য দোষ ত্রুটির সাজা হিসাবে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করে। এমনকী তিনি তার বাবার মৃত্যু সংবাদ জানার পরও তাঁকে দেখতে যেতে পারেননি। চার্চ কর্তৃপক্ষ তাঁকে যেতে অনুমতি দেয়নি। মাত্র ১৫ মিনিটের জন্যই তিনি বাবাকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে দুঃখ করে লিখেছেন, অনেক নানের কপালে সেটুকু সুযোগও আসে না।

জেসমে এক ইংরেজি দৈনিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তিনি তাঁর কলেজে এক তথ্যচিত্র পরিবেশন করতে চাইলেও চার্চ কর্তৃপক্ষ তাকে অনুমতি দেয়নি। জেসমের এই প্রতিবাদী ভূমিকার জন্য তাকে পাগল সাজানো, মিথ্যা অপবাদ দিতেও চার্চের পাদ্রীরা পিছপা হয়নি।

বিষাক্ত কালনাগ আই এস আই

কিরণ শঙ্কর মৈত্র

।। এগারো ।।

গোপন সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছিল যে, ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসের চতুর্থ সপ্তাহে আই এস আই বাংলাদেশে সব শীর্ষস্থানীয় সন্ত্রাসবাদী দলের একটি মিটিং ডাকে। আমন্ত্রিত দলগুলির মধ্যে ছিল লস্কর-এ-তৈবা, হিজ্‌ব্‌-উল-মুজাহিদিন, বাংলাদেশের হরকৎ-উল-জিহাদ -এ-ইসলামি, উল্‌ফা, পিপ্‌ল্‌স ইউনাইটেড লিবারেশন আর্মি, অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স প্রমুখ। ফিলিপাইন্‌স্‌-এর কয়েকটি উগ্রপন্থী দলেরও যোগ দেবার কথা ছিল। তেমনি যোগ দিতে পারে আল কায়দা গোষ্ঠীরও কর্মী। চট্টগ্রামের কাছে সিরসরাই নামক জায়গায় এই জমায়েত হবার কথা ছিল। ভারতের বিরুদ্ধে বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে সন্ত্রাসবাদী ধ্বংসাত্মক কাজ তীব্র ও ব্যাপক করায় প্রধানত এই সভার উদ্দেশ্য ছিল।

আই এস আই তাদের কর্মসূচিতে একটু পরিবর্তন এনে, বিদেশি সন্ত্রাসবাদীদের চেয়ে কাশ্মীরের হিজ্‌ব্‌-উল-মুজাহিদিনের উপরে এখন বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। হিজ্‌ব্‌-কে কাশ্মীরে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত করে, তাদের 'freedom fighter' আখ্যা দিলে অনেক গুরুত্ব পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সি আই ডি তিনজন আই এস আই এজেন্টকে গ্রেপ্তার করেন মে (২০০৪) মাসের প্রথমে। তারা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের ফটো তুলছিল ও তথ্য সংগ্রহ করেছিল। মাজাহুরুল হককে (২৭) গ্রেপ্তার করা হয় হুগলীর শ্রীরামপুর থেকে, আলি মহম্মদ রতনকে (২৮) কলকাতার এক গেস্ট হাউস থেকে এবং তারপর পাওয়া সংবাদের ভিত্তিতে, মালবিয়া নগর থেকে দিল্লী পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ মহম্মদ ইমরানকে (৩৪) গ্রেপ্তার করে। বারাউনি অয়েল রিফাইনারি ও দানাপুর ক্যান্টনমেন্টের ফটোগ্রাফসহ আরও অনেক কিছু তথ্য পাওয়া যায় তার কাছে। বিহারের অধিবাসী ইমরান ২০০২ সাল থেকে পাকিস্তানী গুপ্তচর হিসেবে কাজ করছিল।

লাইন-অফ-কন্ট্রোল বরাবর বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বেড়া তুলে দেওয়ায় আই এস আই এখন সাম্বা, হিরানগর ও আর এস পুরা সেক্টরের নানা জায়গা থেকে এজেন্টদের অনুপ্রবেশ করাবার চেষ্টা করছে। এইসব জায়গা থেকে তারা জম্মু, রাজৌরি, পুঞ্চ , রিয়াসি, উধমপুর, কাঠুয়া, ডোডা অঞ্চ লগুলির অভ্যন্তরে গিয়ে নিজেদের প্ল্যানমাফিক কাজ করতে সচেষ্ট।

প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফ আই এস আই-এর নতুন শীর্ষ নেতা নিযুক্ত করেছিলেন লেজেনারেল আশফাক পারভেজ কিয়ানিকে, অক্টোবর মাসের প্রথমে, যিনি ছিলেন রাওয়ালপিন্ডির কোর কম্যান্ডার। কিয়ানি আগে যখন মিলিটারি অপারেশন্‌স্‌-এর ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন, তখন ভারতীয় সেনাবিভাগের সমপর্যায়ের অফিসারদের সঙ্গে কথাবার্তা হতো। মুশারফ সেনাবাহিনীর আরও কয়েকজন অফিসারের পদোন্নতি ঘটান। এর মধ্যে থেকে আই এস আই-এর উপরে মুশারফের আরও বেশি নির্ভরশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। আই এস আই-এর পূর্বতন প্রধানকেও পুরস্কৃত করেছেন — তাকে 'চার-তারা' জেনারেলের র‍্যাঙ্কে প্রোমোশন দিয়ে।

ফ্রিলান্স সাংবাদিক রুচি সিং-এর কথা মনে আছে, প্রথম পর্বে যার কথা বর্ণিত হয়েছিল। অনেক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথিপত্র তথ্যাবলী তিনি নেপালস্থিত 'স্বামী'র মাধ্যমে আই এস আই-কে পাঠাচ্ছিলেন। ১৯৯৯ সালের ১৯ মে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ তাকে গ্রেপ্তার করেছিল — পশ্চিম দিল্লীর বাসস্থান থেকে। দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে, ৬ অক্টোবর (০৪) বিচারে সিটি কোর্ট তাকে সাত বছরের কারাদন্ড দিয়েছেন। তার নেপালী সহযোগী বিষ্ণুপ্রসাদ পাছিকেও ওই একই সাজা।

২০০৪ সালের ২ অক্টোবর ডিমাপুর রেলওয়ে স্টেশনে এক ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। বিস্ফোরণের অগ্নিকান্ডে মৃতের সংখ্যা পনেরো, আহত ঊনত্রিশ এবং সাধারণভাবে ঘায়েল ত্রিশ। ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া একটি ক্ষতিগ্রস্ত স্যুটকেসের মধ্যে ফিউজ তার ছিল। ঘটানাটির জন্যে প্রথম থেকেই আই এস আই এবং বাংলাদেশ স্থিত সন্ত্রাসবাদীদের কথা লোকেদের মনে এসেছিল। CRPF (Central Reserve Police Force)-এর ডিরেক্টর জেনারেল জি কে সিন্‌হা সেই সন্দেহকে প্রকাশ করে, আই এস আই সংযোগের আভাস দেন।

বর্তমান সন্দর্ভের সপ্তম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পারভেজ মুশারফ আই এস আই-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন — কাশ্মীরে অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মে লিপ্ত মৌলবাদী দলগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যে। কাশ্মীর ভূমির কোনও কোনও আন্দোলনকারী দল নৈতিক ও রাজনৈতিক সাহায্য পেতে পারে, কিন্তু মিলিটারি ট্রেনিং বা অস্ত্রশস্ত্র পাবে না। এই নির্দেশ জারি করা হয়েছিল ২০০২ সালের প্রথমেই। কিন্তু এর পরে আই এস আই-এর ধ্বংসমূলক কর্মবিধিতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। মুশারফ এবং আই এস আই-এর শিখর নেতাদের নানাভাবে পরিপোষক ও পুরস্কৃতই করেছেন।

২০০০-এর ২৯ এপ্রিল ভারতীয় পার্লামেন্টে গৃহমন্ত্রকের একটি রিপোর্ট পেশ করা হয়। এই রিপোর্টে খোলাখুলিভাবে বলা হয় যে — পাকিস্তান বাইরের জগতে সবাইকে জানাবার জন্যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার যে-কথা বলে, বাস্তবে তাদের কাজে তার প্রতিফলন দেখা যায় না। পার্লামেন্টে পেশ করা রিপোর্টটি অবশ্য বাংলাদেশের সহযোগিতায় আই এস আই ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে মৌলবাদী ধর্মীয় জিগির তোলে এবং নানাভাবে যে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করছে, সে সম্বন্ধে নীরব।

২০০০-এর ২৯ এপ্রিল ভারতীয় পার্লামেন্টে গৃহমন্ত্রকের একটি রিপোর্ট পেশ করা হয়। এই রিপোর্টে খোলাখুলিভাবে বলা হয় যে — পাকিস্তান বাইরের জগতে সবাইকে জানাবার জন্যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার যে-কথা বলে, বাস্তবে তাদের কাজে তার প্রতিফলন দেখা যায় না। পার্লামেন্টে পেশ করা রিপোর্টটি অবশ্য বাংলাদেশের সহযোগিতায় আই এস আই ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে মৌলবাদী ধর্মীয় জিগির তোলে এবং নানাভাবে যে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করছে, সে সম্বন্ধে নীরব। এর কিছুদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রীদের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা সম্পর্কিত কনফারেন্সে কিন্তু উত্তর-পূর্ব ভারতে সন্ত্রাসবাদীরা যে ভয়ঙ্কর হিংসার বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে তা বিশেষভাবেই আলোচিত। রিপোর্টটিতে অবশ্য আই এস আই-এর কার্যবিধির ফলে যে আশঙ্কাজনক প্রতিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, সে সম্বন্ধে প্রাপ্ত গোপনীয় তথ্য রাজ্যসরকারগুলিকে সরবরাহ করে তাদের সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেবার কথা বলা হয়েছে। রিপোর্টটিতে নকশাল-তৎপরতা সম্বন্ধেও অনেক তথ্য দেওয়া হয়েছে।

১১ মে নিউদিল্লীর রেলওয়ে স্টেশনে নর্থ-ইস্ট এক্সপ্রেসে শিলিগুড়ি থেকে আসা মহম্মদ আইস-উর-রহমান নামে এক নেপালি নাগরিককে ১.৯৫ লাখ টাকার নকল নোট ও ১০০০ গ্রাম হেরোইনসহ গ্রেপ্তার করা হয়। স্থানীয় এক আই এস আই এজেন্টকে দেবার জন্যে এইসব সে নিয়ে এসেছিল।

ভারতে যে অব্যাহতভাবে, সুযোগ খুঁজে নিয়ে, জাল নোট আমদানি করা হচ্ছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ২০০৬ সালের ১৫ এপ্রিল, যখন দিল্লীতে আমির আহমেদ ও তেহসিম কুন্‌জরে নামে দু'ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই সকল নোট তারা পেয়েছিল পাকিস্তানে — আই এস আই এজেন্টদের কাছ থেকে। তেহসিম স্বীকার করে যে, সে ৫০ লাখ টাকার নোট ভারতে নিয়ে এসেছে। পাকিস্তানে একজন আই এস আই কন্ট্রাক্টের কাছে এগুলি সে পেয়েছিল। এক একবার তারা কম পরিমাণের নোট নিয়ে আসে। মেয়েদের উঁচু প্ল্যাটফর্ম হিল জুতোর মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকার নোট লুকানো যায়। জামা মসজিদের কাছে কবুতর মার্কেটে এজেন্টরা পাকিস্তান থেকে আগত ট্রেন যাত্রীদের তারা নিয়ে আসে। তারা লাহোর অথবা আটারি এক্সপ্রেস থেকে বাসে ভারতে রওনা দেয়, প্লেন যাত্রীদের তারা এড়িয়ে যায়, কারণ সেখানে খুব বেশি চেকিং হয়। নকল নোটের এই চোরাকারবারিরা অনেক কোড শব্দ ব্যবহার করে। যেমন পাঁচশো টাকার নোটকে উল্লেখ করা হয় 'সিঙ্গল বেডসিট', হাজার টাকার নোটকে 'ডাবল বেডসিট'। পুলিশের সূত্রানুযায়ী ১ লাখ জাল নোট পাচার করে তারা বাষট্টি হাজার টাকা উপার্জন করে।

পুলিশ নিজেদের সূত্রে খাজুরি খাস থেকে আমির আহমেদকে গ্রেপ্তার করেন। একজন ডিকয়কে (নকল খদ্দেরকে) আমিরের কাছে পাঠিয়ে তারা তেহসিমের খোঁজ পেয়ে যান এবং তেহসিম নকল নোট দেয়। পুলিশের অ্যাডিশনাল কমিশনার (ক্রাইম ব্রাঞ্চ) এই অভিযান চালিয়েছিলেন। তেহসিম সম্প্রতি দু'বার পাকিস্তানে গিয়েছিল। তারা অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র — প্রধানত রিভলবার ও পিস্তলও এদেশে আমদানি করে। ১৭ জুলাই ফরিদাবাদ থেকে রাণী ও কিরণ নামে দুই মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের কাছ থেকে বায়ুসেনা সম্বন্ধীয় ম্যাপসহ বহু তথ্য ও দস্তাবেজ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ কর্তৃপক্ষ এদের কথা জানতে পেরেছিলেন, যখন অসম পুলিশ মহম্মদ হানিফ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন। হানিফ অনেক গোপন তথ্য পাচার করছিল দেশদ্রোহী ব্যক্তিদের কাছে। হানিফ বলে — সে গৌতম বুদ্ধ নগরের অধিবাসী। দু হাজার চার সালের ২ জুলাই নয়ডা থেকে যখন সালিম ওরফে প্রকাশ চাওলা নামে এক আই এস আই এজেন্টকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তখন ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজনের সুরক্ষা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ চিন্তা ব্যক্ত করেছিলেন। দিল্লীর উপকণ্ঠবাসীরা এজন্যে সরকারের ভ্রান্ত পরিকল্পনা ও নীতিকে দোষারোপ করেছিলেন। ওদিকে পুলিশ বলেন, রোজই অজস্র বাইরের লোক দিল্লী এবং তার চারপাশে এসে ছড়িয়ে পড়ছে, অনেকে স্থায়ী আবাসগৃহ বানাচ্ছে। হাজার হাজার অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশীও রয়েছে তাদের মধ্যে। অনেকে আবার রেশন কার্ডও বানিয়ে ফেলেছে বহু লোক বেনামীতে। অনেক টাকা পয়সা দিয়ে বাড়ি ভাড়া নিচ্ছে। গৃহস্বামীরা বাড়ি ভাড়া দেবার সময়ে ভাড়ার টাকার দিকেই বেশি দৃষ্টি দেন। ভাড়াটেদের উপরে নয়। ফলে অনেক বেআইনি, বিদেশী, অসামাজিক ও সন্ত্রাসবাদীরা বহাল তবিয়তে নিজেদের কুকর্ম করে যাচ্ছে।

নাম ভাঁড়িয়ে, প্রমাণপত্র জোগাড় করে, কী ভাবে আই এস আই এজেন্টরা এদেশে কাজ করছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ ভিকাজি কামা প্লেস থেকে ইরফান কৌসরকে (২৪) গ্রেপ্তার করে। ভিকাজি কামা প্লেসের কাছে সে একটি সাইবার কাফে চালাচ্ছিল এবং পাঞ্জাব ও জম্মু-কাশ্মীরে সেনাবাহিনী সম্বন্ধে খবর জোগাড় করে পাঠাচ্ছিল। ধরা পড়লে সে বলে — তার নাম 'অশোক গুপ্তা' এবং প্রমাণ করার জন্যে একটি ভোটার আইডেন্টি কার্ডও দেখায়। পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (ক্রাইম), তেজেন্দ্র লুথ্‌রা জানান — লাহোর ক্যাম্পে ইরফানকে আই এস আই ট্রেনিং দিয়েছে, অনেক ভারতীয় ভাষা জানে সে। লাহোরে একটি পাব্লিশিং হাউসে যখন সে টাইপিস্টের কাজ করে তখনই আই এস আই-এর সংস্পর্শে আসে। তার কাছে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার পরিবারকে মাসে মাসে কুড়ি হাজার টাকা দেওয়া হয় -ভারতে গুপ্তচর বৃত্তি করার জন্যে। আগে সে আম্বালা থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর খবর পাঠাত। ২৫ জুলাই করাচী যায় বাংলাদেশে যাবার জন্যে। ঢাকা থেকে সে কাঠমাণ্ডু যায়। পরে ভারত সীমান্ত পার হয়ে বিহারে। আবার সে আম্বালা গিয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে ১৩ আগস্ট দিল্লী আসে। ট্রান্স-যমুনা এলাকায় একটি পরিবারে সে থাকতো যাদের পাকিস্তানে আত্মীয়তা রয়েছে। কৌসর নিজে সাইবার কাফে চালাত বলে সে আরও বিপজ্জনক। মার্চ মাসে উত্তমনগর থেকে যে লস্কর উগ্রবাদীদের ধরা হয় তারা ই-মেলে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। সন্ত্রাসবাদীরা জানে কোনও নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে যোগাযোগ করা সবচেয়ে নিরাপদ।

পাঞ্জাব পুলিশ কয়েকদিন পরেই আরেক আই এস আই এজেন্ট, মহম্মদ রমজানকে গ্রেপ্তার করে সাংগুর থেকে। রমজান পাঞ্জাবে ইরফানকে শুধু আশ্রয়ই দেয়নি, তাকে নিয়ে আম্বালা ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে মিলিটারি ব্যারাকগুলির ফটো তুলেছে। রমজান অন্তত চারবার পাকিস্তানে গিয়ে লাহোরে আই এস আই কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে। সে ছিল আই এস আই-এর নিয়মিত বেতনভোগী। ভারতে আই এস আই এজেন্টদের সব রকম সাহায্য দেওয়া ছিল তার কাজ। আরও জানায় যে তার বোন সাজিদা পাকিস্তানী নাগরিক। লাহোরের স্থায়ী বাসিন্দা। তার মাধ্যমেই সে আই এস আই-এর সংস্পর্শে আসে।

(চলবে)

ধনীদের রাজনীতি, রাজনীতি ধনীদের

রুদ্র রায়

এখন অনেককেই বলতে শোনা যায় জীবনে কিছু করতে না পারলে, রাজনীতি করবি। উপদেশটা সাতের দশকে দেওয়া কঠিন ছিল। সে সময় রাজনীতির ধারাটা ছিল অন্যরকম। জনমুখী। এখন রাজনীতি

এম কৃষ্ণাপ্পা

হচ্ছে কিছু করে-কম্মে খাওয়ার রাস্তা। এই পথে এসে 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' হবার দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে। ভুরি ভুরি নেতা-নেত্রী রয়েছেন, যারা রাজনীতিতে এসে কোটিপতি। সম্প্রতি 'ইন্ডিয়া টুডে' সূত্রে এ দেশের নেতা-নেত্রীদের যে সম্পত্তির পরিমাণ জানা গিয়েছে, তা দেখলে চোখ ছানাবড়া হওয়া অস্বাভাবিক নয়। টি সুববারামি রেড্ডি র কথাই ধরা যাক। রাজ্যসভার এই সাংসদ মহোদয়ের সম্পত্তির পরিমাণ ২৩৯.৬ কোটি। ২০০৪ সালে তিনি এই সম্পত্তির হিসাব নির্বাচন কমিশনারের কাছে পেশ করেন। সামান্য একজন রাজমিস্ত্রী-কন্ট্রাক্টর থেকে আজ তিনি দেশের বড় একজন কন্ট্রাক্টর। শুধু এই ক্ষেত্রেই তিনি সীমাবদ্ধ নন। বিনিয়োগ করছেন স্টীল, শক্তি উৎপাদন ক্ষেত্র গুলিতেও। সুববারামি রেড্ডি কংগ্রেসের অন্ধ্রপ্রদেশের একজন সদস্য হিসাবে কাজ শুরু করেন। মুম্বাই, হায়দরাবাদ পর্যন্ত দলে এখন তাঁর পরিচিতি। ১৯৯৬ সালে লোকসভার সদস্য হন। ১৯৯৮ থেকে রাজ্যসভার নির্বাচিত সাংসদ। তিনি বড় ব্যবসাদার সন্দেহ নেই, কিন্তু এত টাকা রোজগার রাজনীতিতে না এলে, কোনও ভাবেই সম্ভব হতো না। সম্পত্তির সিংহভাগ জমেছে রাজনীতি থেকেই। এমন সুববারামি রেড্ডি ভারতের রাজনীতিতে অনেক রয়েছেন। ঠিক যেন 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে'র মতো। আমজনতার প্রতিনিধি হিসাবে যারা ক্ষমতা পেয়েছেন, এখন তাদের সম্পত্তির পরিমাণ একজন আম জনতার সারা জীবনের উপার্জনের থেকে পাঁচগুণ বেশি। রাজনীতিতে হাজরপতিরা পাত্তা পায় না। লাখপতির

আনন্দ সিং

সংখ্যাও কম নয়। তবে কোটিপতিদেরই দাপাদাপি বেশি।

অথচ আমাদের দেশের ৭০ শতাংশ মানুষের দৈনিক রোজগার ২০ টাকারও কম। জনদরদী নেতারা সেখানে টাকার গদিতে বসে। এদের চোখের সামনেই কত নীলিমার সন্তান না খেতে পেয়ে মারা যায়। কত সুশীল বালকের পড়াশোনা মাঝ পথে থেমে যায়। কত রমণীর চোখেই না জল ঝরে। কত তুলিকে অকালে অর্থের অভাবেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করতে হয়। আমাদের দেশের রাজ্যসভার অর্ধেক সাংসদের সম্পত্তির পরিমাণ কোটির ঘরে। কংগ্রেসের অনিল এইচ লাড। কর্ণাটকের এই সাংসদের সম্পত্তি ১৭৫ কোটি। সমাজবাদী পার্টির (উত্তরপ্রদেশ) রাজ্যসভার সাংসদের সম্পত্তি ২১৪.৩ কোটি।

এখানেই শেষ নয়। এরকম আরও অনেক রয়েছেন। ঠগ বাছতে বসলে গাঁ উজাড় হয়ে যাবার অবস্থা দাঁড়াবে। বিধায়কেরাও কম যান না। তাদেরও সম্পত্তির সিংহভাগ জমেছে রাজনীতিরই দৌলতে। সব দলেরই এই একই চিত্র। কর্ণাটকের বিজেপি বিধায়ক আনন্দ সিং, যার সম্পত্তি ৯২ কোটি টাকা। কর্ণাটকের কংগ্রেস বিধায়ক এন এ হারিসের সম্পত্তি ৪৫.৩ কোটি।

সম্পত্তির পার্টিগণিতে দেখা যাচ্ছে এদেশের ১০ জন ধনী বিধায়ক ও রাজ্যসভা থেকে নির্বাচিত সাংসদের সম্পত্তি যোগ করলে দাঁড়ায় ১,৫০০ কোটি টাকা। যাদের মধ্যে রয়েছেন কংগ্রেসের টি সুববারমি রেড্ডি, কংগ্রেসের এম কৃষ্ণাপ্পা, মাম রামাস্বামী প্রমুখ।

এই সব সম্পত্তির পরিমাণ হল ২০০৪ এর দাখিল করা হিসাব মতো। মাঝখানের ৪ বছরে এই সম্পত্তির পরিমাণ আরও বেড়েছে তা সহজেই। পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করলে, যে কোনও সভ্য নাগরিকের লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

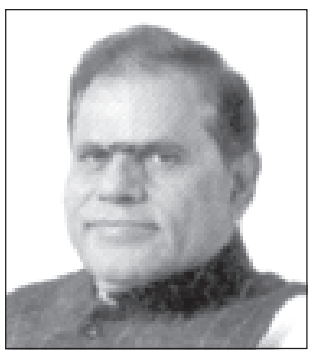

টি এস সুব্বারামি

উত্তরপ্রদেশের কথাই ভাবুন। দলিতনেত্রীর রাজ্যে তিনি ইতিমধ্যেই কোটিপতি। তিনি শুধু একা নন। তাঁর রাজ্য আরও ১৩৩ জন বিধায়কের সম্পত্তিও কোটির ঘরে। যার মধ্যে রয়েছেন অজয় প্রতাপ সিং (কংগ্রেস)। তার সম্পত্তির পরিমাণ ৩১.৮ কোটি। নন্দগোপাল গুপ্তা (বিএসপি)-র সম্পত্তি ১৫.৩ কোটি। ধরম পাল যাদব (আর পি ডি)-এর সম্পত্তি ১৪.৪ কোটি। তাঁর রাজ্যে বিধায়কদের এমন দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি। অথচ মায়াবতীর রাজ্যের ৫৯ শতাংশ জনগণ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। সেখানে খোদ মুখ্যমন্ত্রী

জয়া বচ্চন

মায়াবতী ৩০টি রাজ্যের মধ্যে সব থেকে ধনী মুখ্যমন্ত্রী।

সর্বহারাদের পার্টি বলে যারা বড়াই করে, সেই সি পি এমে রয়েছে কোটিপতিদের উঠা বসা। পশ্চিমবঙ্গের বিধায়ক রবিলাল মিত্রর কথাই ধরুন। তাঁর সম্পত্তি ৬.৬ কোটি। প্রতিভারঞ্জন মুখার্জ্জির সম্পত্তি ১.৪ কোটি। পরিসংখ্যান বলছে ৩০১ জন সিপিএম বিধায়কের সম্পত্তির পরিমাণ কোটির ঘরে। কোটিপতিদের এই চিত্র সব দলের মধ্যেই। বাদ নেই বিজেপির মতো দলেও। গুজরাটে বিধায়ক সৌরভ প্যাটেলের সম্পত্তি ৬৫.৩ কোটি। অসমের কার্তিক সেনা সিন্‌হার সম্পত্তিও ৪ কোটির ওপর। লালুর হ্যারিকেনই হোক, বা মায়াবতীর হাতি — সব রাজনৈতিক দলের মানচিত্রে এখন কোটিপতিদের দাপাদাপি। তাদের দর বেশি। তারাই দলের শীর্ষে।

দশ ধনী সাংসদ ও বিধায়কের সম্পত্তির ঠিকুজী

টি এস রেড্ডি	রাজ্যসভার সাংসদ	কংগ্রেস	অন্ধ্রপ্রদেশ	২৩৯.৬ কোটি
জয়া বচ্চন	রাজ্যসভার সাংসদ	সমাজবাদী পার্টি	উত্তরপ্রদেশ	২১৪.৩ কোটি
রাহুল বাজাজ	রাজ্যসভার সাংসদ	নির্দল	মহারাষ্ট্র	১৯০.৬ কোটি
অনিল এইচ লাড	রাজ্যসভার সাংসদ	কংগ্রেস	কর্ণাটক	১৭৫.০০ কোটি
এম কৃষ্ণাপ্পা	রাজ্যসভার সাংসদ	কংগ্রেস	কর্ণাটক	১৩৬.০০ কোটি
মাম রামাস্বামী	রাজ্যসভার সাংসদ	জনতাদল সেকুলার	কর্ণাটক	১০৭.৭ কোটি
আনন্দ সিং	বিধায়ক	বিজেপি	কর্ণাটক	৯২.০০ কোটি
মালগাওকার	বিধায়ক	নির্দল	গোয়া	৯১.৪ কোটি
এন এ হারিস	বিধায়ক	কংগ্রেস	কর্ণাটক	৪৫.৩ কোটি
মহেন্দ্র মোহন	রাজ্যসভার সাংসদ	সমাজবাদী পার্টি	উত্তরপ্রদেশ	৪৫.০০ কোটি

ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে স্বামী রামদেবের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের কাছে সরকারি অর্থ আয়-ব্যয়ের হিসাব চাওয়ার আহ্বান জানালেন যোগগুরু বাবা রামদেব। জানুয়ারি মাসে কর্ণাটকের বেলগাঁওতে অনুষ্ঠিত এক যোগ শিবিরে তিনি দেশবাসীর কাছে এমন আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, পার্টির নেতা, সরকারি আমলা, বিধায়ক, সাংসদ, এমনকী মন্ত্রীদেরও সম্মিলিতভাবে প্রশ্ন করুন, সরকারি বরাদ্দের টাকা তারা কীভাবে খরচা করছেন। খরচার ফলে কাজ কতটা হয়েছে তারও হিসাব মিলিয়ে নেবার জন্য তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানান।

গত এক দশক ধরে রামদেবজী যোগ শিক্ষা ও রোগ আরোগ্যের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন। মাঝে মধ্যেই বিদেশী কোম্পানীর ভেজাল দ্রব্যের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। ২০০৭ সালের শেষের দিকে তাঁর অগণিত যোগানুরাগীদের নিয়ে দেশব্যাপী একটি সাংগঠনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলেন। রোগ আরোগ্য ছাড়াও সুস্থ ও সবল সমাজ তথা সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে, যোগানুরাগীদের সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। সম্প্রতি তিনি দুর্নীতিগ্রস্থ নেতা আমলাদের বিরুদ্ধে সরব হলেন।

রামদেবজীর এবারের উদ্যোগের বিশেষত্ব হল, তিনি শুধুমাত্র আহ্বান বা পথ

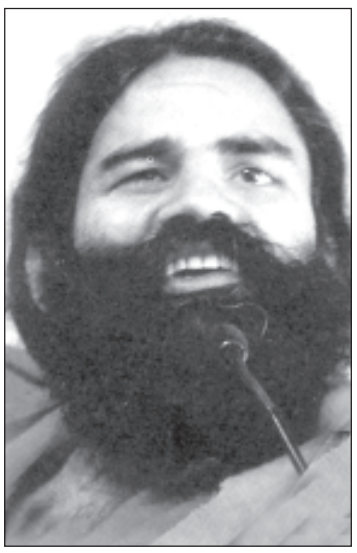

নির্দেশ করেই ক্ষান্ত হননি। একই সঙ্গে তা কার্যকরী করার সক্রিয় পদক্ষেপও নিয়েছেন। দুর্নীতি বা ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে একটি ট্রাস্ট গঠন করেন। টাস্টের নাম ভারত স্বাভিমান ট্রাস্ট। এই টাস্টের মূল কাজ হল জনতার স্বার্থ তথা রাষ্ট্রীয় দিকগুলিকে নিয়ে নিরীক্ষণ, সর্বপোরি তা কার্যকর করা। ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত বিদ্বেষ সৃষ্টির ওপরে উঠে যথার্থ হিতের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া।

এই প্রসঙ্গে এক বিবৃতিতে রামদবেজী জানান, আধ্যাত্মিকতা ভারতের প্রাণ ভোমরা। কিন্তু তার প্রকাশ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরের মধ্য থেকে হওয়া উচিত। শুধু মাত্র মন্দিরই আধ্যত্মিকতার স্থান নয়। সমাজের সর্বস্তরেই আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ প্রয়োজন বলে রামদেবজী মন্তব্য করেন। সেই লক্ষ্যেই তার এমন পদক্ষেপ বলেও তিনি জানান।

গুজরাট মডেল

বেশ কিছুদিন যাবৎ নরেন্দ্র মোদীর গুজরাট বিশ্বায়ণের ভারতীয় মডেল হয়ে ওঠায় দেশ-বিদেশে সাড়া পড়ে গেছে। দেশী কর্পোরেটরাই নয়, বিদেশী এমন কী আরব থেকে শেখরাও আসছেন বিশাল বিনিয়োগের ভান্ডার নিয়ে। দেশী ও শিল্পপতিরা তো নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চান। ১ নং অকর্মা রাজ্য পশ্চিমবাংলা । তাই বোধহয় কেরলের তরুণ এম পি আবদুল্লা কুট্টী নরেন্দ্র মোদীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সিপিএম শাসিত রাজ্যগুলিকে মোদীর পথ অনুসরণ করতে বলেছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে রাজীব গান্ধী ফাউণ্ডেশনের (যার প্রধান সোনিয়া গান্ধী) ডাইরেক্টর বিবেক দেবরায় মোদীর গুজরাটকে আর্থিক উন্নয়ণে এক নম্বর বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাতে অবশ্য সোনিয়া গান্ধী খুশী হননি। তাই ডাইরেক্টর পদত্যাগ করেছিলেন।

এদিকে গোধরায় ৫৮ জন হিন্দু করসেবককে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে যে ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে যে দাঙ্গা হয়েছিল তার জন্য বাম-কংগ্রেস, লালু-মুলায়ম কত অসত্য কুৎসা করেছে। সোনিয়া ম্যাডাম গুজরাট নির্বাচনে মোদীকে 'মউৎ কা সওদাগর' বলে যে রাজনৈতিক চপেটাঘাত খেয়েছিলেন তা গেলা সহজ নয়। আর কুতুবুদ্দিনকে পঃ বাংলায় এনে সেলিমবাবুরা মুসলিম ভোট পেতে রাজনীতি করেছিলেন। তবে সুভদ্র নরেন্দ্র মোদী ন্যানো গুজরাটে যাওয়ার পর দুই খানা চিঠি যথাক্রমে বুদ্ধ দেব ও মমতাকে আনন্দবাজারের প্রথম পৃষ্ঠায় দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন।

আমরা বিশ্বাস করি শুধু গুজরাট নয় কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, উত্তরাখণ্ড সমস্ত রাজ্যগুলিও এক একটি গুজরাট হয়ে উঠবে। ২০০২ সালের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে গুজরাটের যে ক্ষতি হয়েছিল তার কোনও চিহ্ন সেখানে নেই। প্রত্যেক রাজ্য যদি গুজরাটের মতো আর্থিক উন্নতি, সুশাসন, সুশিক্ষা, বেকারী দূরীকরণ করে তাহলে সারা দেশ সমৃদ্ধ হবে। কলের পুতুল প্রধানমন্ত্রী দিয়ে কোনও কাজ হয় না। অনেকেই প্রধানমন্ত্রী হতে চান। তাদের ভোট দিলে দেশ গোল্লায় যেতে খুব দেরি নেই। তাই আশা করবো, আগামী ভোটে নতুন প্রজন্ম যেন ভেবে-চিন্তে ভোট দিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ গঠন করেন।

বৈদ্যনাথ ঘোষ, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগণা।

জঙ্গি দমন

ভারতসহ গোটা বিশ্বজুড়ে মুসলমান জঙ্গিরা যে নৃশংস নাশকতামূলক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে তাতে অবশ্য কোনও নতুনত্ব নেই — অভিনবত্ব নেই। বস্তুত ইসলাম ধর্মমতের সৃষ্টিলগ্ন থেকেই জঙ্গিরা সব রকম নাশকতামূলক কার্যকলাপ চালিয়ে আসছে। ইসলাম ধর্মমতের প্রচার ও প্রসার কার্যত আগ্রাসী নৃশংসতা নির্ভর। ইসলাম ধর্মমত যে দেশে গেছে সেই দেশের ধর্ম-সংস্কৃতি পরম্পরা নির্দয়ভাবে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ইসলামের দর্শনে পৃথিবীতে অবিশ্বাসীদের (অমুসলমান) বাঁচার কোনও অধিকার নেই। ইসলামের আগ্রাসী নৃশংসতার সামনে অবিশ্বাসীদের কেবল মাত্র দুটি পথ খোলা — হয় ইসলাম ধর্মমত গ্রহণ নয় মৃত্যুবরণ। অন্য কোনও স্থায়ী বিকল্প পথ নেই। অন্য ধর্মাবলম্বীদের গৃহদাহ, ধনসম্পদ লুঠ, নারীহরণ, ধর্মান্তর, ধর্ষণ, হত্যা, রক্তপাত — ইসলামের অপরিহার্য অঙ্গ। বস্তুতঃ প্রায় দেড় হাজার বছরের ইসলামের ইতিহাসে মুসলমান জঙ্গিরা কত মঠ-মন্দির-দেবস্থান ধ্বংস করেছে, কত মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছে, কত হিন্দুভূমি বলপূর্বক দখল করেছে, কত শিশু-বৃদ্ধ -নারী-পুরুষ নির্বিশেষে হিন্দুকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, হিন্দুনারীকে ধর্ষণ ও হীন জীবনযাপনে বাধ্য করেছে এবং কত নিরাপরাধ হিন্দু মুসলমান জঙ্গিদের ভয়ে পিতৃ-পিতামহের বাস্তুভিটা পরিত্যাগে বাধ্য হয়েছেন — তার কোনও সীমা পরিসীমা নেই।

ভারত বিভাজনের দাবিতে মুসলমানদের বক্তব্য ছিল — হিন্দু মুসলমান দু'টি পৃথক জাতি, তাদের ধর্মসংস্কৃতিও পৃথক, হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানরা একত্রে বসবাস করলে মুসলমানদের ধর্মসংস্কৃতি বিপন্ন হবে। তাই তাদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান চাই। কিন্তু নিয়তির পরিহাস এই যে, বর্তমানে যতজন মুসলমান পাকিস্তানে বসবাস করেন তার চেয়ে বেশি সংখ্যায় মুসলমান বসবাস করেন ভারতে। ভারতে যদি মুসলমানদের ধর্ম-সংস্কৃতি অদ্যাবধি বিপন্ন না হয় তবে তো পাকিস্তান সৃষ্টির যৌক্তিকতাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। আর যদি সত্য সত্যই ভারতে মুসলমানদের ধর্মসংস্কৃতি বিপন্ন, তবে বিপন্ন ধর্মসংস্কৃতি নিয়ে তাঁদের ভারতে বসবাস করার প্রয়োজনই বা কোথায়? তাঁরা তো স্বেচ্ছায় তাঁদের সাধের মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানে চলে যেতে পারেন — তাঁদের জন্যই তো পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছে।

সত্যকথা স্পষ্ট বলাই ভাল। হিন্দু-মুসলমানদের জীবন ধারায় কোনও সাযুজ্য নেই বরং বৈপরীত্যে ভরা। বেশি উদাহরণের প্রয়োজন নেই — দু' একটি উদাহরণই মনে হয় যথেষ্ট হবে। হিন্দুরা সশ্রদ্ধায় দেব-দেবীর মূর্তি গড়েন, পূজা করেন। কিন্তু সঘৃণায় দেব-দেবীর মূর্তি অপবিত্রকরণ, অবমাননাকরণ ও ধ্বংসকরণ মুসলমানদের ধর্মীয় কর্তব্য।

চিঠিপত্র

মূর্তিপূজক ও মূর্তিধ্বংসকারীদের মধ্যে সম্প্রীতি কীভাবে সম্ভব হতে পারে? গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণ হিন্দুসমাজে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং গো-মাতারূপে স্বীকৃত ও পূজ্য। কিন্তু নৃশংসভাবে গোহত্যা ও সোল্লাসে গোমাংস ভক্ষণ মুসলমানদের জীবনধারার অঙ্গ। গো-পূজক ও গো-হত্যাকারীদের মধ্যে সম্প্রীতি কীভাবে সম্ভব হতে পারে?

হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কার্যত সম্প্রীতি কোনওদিনই ছিল না, এখনও নেই এবং ভবিষ্যতেও হবে না। কেননা মুসলমানদের একমাত্র ধর্মগ্রন্থ কোরানে আল্লার পরিষ্কার নির্দেশ — বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের উপাস্য আলাদা, বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদের মতো বহু দেবতায় বিশ্বাসী নয়। মূর্তিপূজা করে না—(সুরা ১০৯, আয়াত ১-৬)। অতি সম্প্রীতি হিন্দু-মুসলমানের ব্যবহারিক সম্পর্ক যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে স্বয়ং ভগবান ও আল্লাও যদি বসে সম্প্রীতি বৈঠক করেন তবুও মনে হয় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি আর সম্ভব নয়।

ডঃ সুশীলকুমার সরকার, হরিণঘাটা, নদীয়া

পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ

ভারতবর্ষ আজ বারুদের স্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে। পাকিস্তান হল সন্ত্রাসবাদের পীঠস্থান। কিন্তু যারা যুদ্ধ করবে তারা সব কংগ্রেস, যে শাসক দ্বারা যুদ্ধ আরও তিনবার পাকিস্তানের সঙ্গে হয়েছে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি, বরং ক্ষতি হয়েছে। যেমন (১) ভারতের মাথা কাশ্মীরের অর্ধেক নেই, (২) বাংলাদেশ নামে নতুন রাষ্ট্র যা সন্ত্রাসবাদের দ্বিতীয় স্থান এবং (৩) অনুপ্রবেশ দ্বারা ভারতকে পুনরায় ভাগ করা। তাহলে যুদ্ধ করে লাভ কি? শরীরে যদি কোনও স্থানে ক্যান্সার হয়, তাহলে আমরা কি করি— তৎক্ষণাৎ সেই স্থানটি বাদ দিই। যদি মনে হয়, সত্যি পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের পীঠস্থান, তাহলে তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হোক, নয় তো বুঝব বর্তমান শাসক দল যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা করছে, সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য।

সমর মণ্ডল,লক্ষীপুর, অসম।

বিজেপি ভোট পাখি হলে মমতার দল কি?

শ্যামল হাতি

ধন্য মমতা ব্যানার্জী। আপনার বোধোদয় হয়েছে। বিজেপি এবং এন ডি এর উপর আপনার মোহ ভঙ্গ হয়েছে। এটা তো হওয়ারই ছিল। আপনি হলেন আগমার্কা অসাম্প্রদায়িক। আপনাকে কি বিজেপির সাথে মানায়? আপনি তো সারা বছর মাঠে থাকেন। রাজনীতির মাঠে। আপনি পুজোয়, ইদে, ইফতার পার্টিতে, মতুয়া সম্মেলনে, গুরু গোবিন্দ সিংহের জন্মদিনে, বড়দিনে, সন্ত রবিদাসের জন্ম দিনে অর্থাৎ সব স্থানেই আছেন। এতো আপনারই কথা। সাধু, সাধু। আর বিজেপি হল ভোট পাখী। ভোটের সময় এরা কত রকমের কথা বলে, এও আপনারই কথা। আবার আপনাকে সাধুবাদ জানাই বি জে পি-কে চেনার জন্য। জানেন, আপনি যা বলেন তার সবটাই সত্যি। তার ভেতর কোনও জল নেই। যেমন তহেলকা কান্ডের পর আপনি এন ডি এ ছেড়ে দিলেন। কী সৎ আপনি। কিন্তু বাংলার মানুষ তা একদম বুঝল না। আপনাকে আট থেকে এক-এ নামিয়ে আনল। এদের বেইমান বলাই ভাল। কি বলুন? নারকেল মুড়ি খাওয়া এবং হাওয়াই চপ্পল পরা চেহারা কি ভুলে যাওয়ার কথা? নিতান্ত বেইমানরাই এমন কাজ করতে পারে। কি বলুন? যাক আপনি এসব নিয়ে মোটেই ভাববেন না। যেমন চলছেন তেমনই চলুন। আমরা আছি আপনার সাথে। তবে নিন্দুকের থেকে একটু সাবধান। ওরা যা তা বলে। ওদের কথা কানে তুলবেন না। ওরা যা বলে বলুক। আপনি আপনার কথার ফুলঝুরি চালিয়ে যান।

এই তো আগের বিধানসভার নির্বাচনের সময় আপনি বাংলার মানুষের কাছে ভোট চেয়ে বলেছিলেন "হয় এবার, নয়তো নেভার"। কি সুন্দর স্লোগান ছিল। ভাবলে এখনও মন পুলকিত হয়। নিন্দুকে যা বলে বলুক। আপনি তো ওদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে কী সুন্দর আবার ভোটের বাজারে এসেছেন। আপনি তো আমাদের আদর্শ। আপনি তো বাংলার ওবামা। ওরা পারত, এত বড় কথা বলার পর, আবার নির্বাচনে মুখ দেখাতে? আপনি কত মহৎ, তাইতো আপনি "নেভার" বলার পরও আবার রাইটার্সে ঢোকার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন। চালিয়ে যান। বাংলার মানুষের স্মৃতিশক্তি কম। ওরা পিছনের কথা ভুলে যায় ভাগ্যিস।

পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেতে গেলে ভাল ভাল চ্যাপ্টারগুলো ভালো করে পড়তে হয়। আপনিও ঠিক তেমন, নির্বাচনের গণিতটা সুন্দর বোঝেন। ভাল ভাল চ্যাপ্টারের মতো সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামকে গ্রহণ করেন। ঠিক তেমনি ভারতমাতা এবং দেবী সরস্বতীর নগ্ন ছবি আঁকার পর যারা আন্দোলন করেছিল তাদের বিরুদ্ধে ও আপনি যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। আপনাকে তো ওই সব ক্ষেত্রে দমানোই যায় না। আপনি কত ভাবেই নিন্দা করেন। এছাড়া আপনি প্রতি বছর ৬ ডিসেম্বর একাদশী পালন করেন। মহৎ না হলে কেউ এতটা করতে পারে না। এইসব অধ্যায় হল খুব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আপনি তা একদমই ছাড়েন না। আর যে সব অধ্যায় হাল্কা আপনি তা একদমই পড়েন না। এতো সব ভাল ছেলেরাই করে থাকে। যেমন আপনি তসলিমা নাসরিনকে বাংলা থেকে তাড়াবার জন্য দু'বছর আগে মুসলিম মৌলবাদীরা কলকাতা এবং তার আশে-পাশে যে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করেছিল, তার জন্য অন্য সব বুদ্ধ জীবীদের মতো আপনিও একটাও শব্দ ব্যয় করেননি। কী বুদ্ধি আপনার! গত সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) থেকে পর পর মুসলিম মৌলবাদীরা একটি ইংরাজি সংবাদপত্রের অফিস সমেত কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে এবং আসে-পাশের জেলাতেও হামলা চালায়। ওদের অভিযোগ সংবাদপত্রের ৫ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় একটা আর্টিকেলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে। সম্পাদককে গ্রেপ্তার করতে হবে এই দাবি নিয়ে ওরা গোটা শহরকে লন্ড-ভন্ড করে দিল। আমাদের সংবিধানে মত প্রকাশের, লেখার এবং ছাপার স্বাধীনতা আছে। এটা আমাদের মৌলিক

জনমত

অধিকার। এরা তো সাংবিধানকেও তোয়াক্কা করছে না। আইন হাতে তুলে নিচ্ছে। আর এই সময়ে আপনি এমন চুপ করে আছেন। লোকে ভাবছে আপনি বোধ হয় বিদেশে আছেন। ছোটরা যারা লুকোচুরি খেলে তারা বলছে "আপনি খুব ভাল খেলোয়াড়, কী সুন্দর লুকিয়ে আছেন।" ঠিক কাজই আপনি করেছেন। ওরা যা বলে বলুক। আপনি আপনার ভোটে ধস নামতে দেবেন কেন? তার থেকে চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমতীর কাজ। বোকারা তো সব ব্যাপারে কথা বলে।

আর যেই যাই জানুক, আমরা জানি আপনার বুদ্ধির গভীরতা কত। তা না হলে বিজেপির মতো একটা সর্বভারতীয় দলের কাছ থেকে যা সাহায্য নেবার তার সবটাই নিয়েছেন। বি জে পি'র কাঁধে চেপে আপনি সারা ভারতে মমতাময়ী হয়েছেন। বোকারা তো একটা লোককে সারা জীবন ধরে রাখে। আপনি চালাক। তাই ঠিক সময়ে বিজেপির কাঁধ থেকে নেবে অন্য কাঁধে ওঠার চেষ্টা করছেন। এতে দোষের কি আছে? কিছুই দোষের নেই। আধুনিক বাংলা শব্দে একে "চুক্কি" দেওয়া বলে। তা আপনি একটা ভাল "চুক্কি" দিলেন। সাবাস, সাবাস। এখন কিছু না পেয়ে নিন্দুকেরা বলছে। "কিসে আর কিসে, এ যেন কোথায় রাণী রাসমণি আর কোথায় ....।" ওরা বড় বাজে লোক। ওরা আপনার সততা আপনার মহৎ দিকটা দেখছে না।

আপনার সততার কথা বললে ওরা বলে, ও যদি এতই সৎ হবে তা হলে কি করে অমর সিং-এর সঙ্গে এত ভাব? অমর সিং তো মুলায়ম সিংকে তার হিসাব বহির্ভূত আয়ের হাত থেকে এবং সিবিআই-এর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কংগ্রেসকে সমর্থন করেছে। এই কথাগুলো অমর সিং প্রকাশ্যেই সাংবাদিকদের বলেছে। ওই নিন্দুকেরা বলছে, অমর সিং-এর সঙ্গে 'সৎ' মমতাকে মানায় না। ওরা হেঁসে হেঁসে বলছে। রতনে রতন চেনে। তাই দোস্তি। যাক দিদি, এসব নিয়ে চিন্তা করবেন না। জয় আপনার হবেই দিদি। রাইটার্সে আপনি ঢুকবেনই।

আর একটা কথা বলি। নিন্দুকেরা বলে আপনার দলের জন্ম বিজেপির বাড়া ভাতে ছাই দেওয়ার জন্য। বিজেপির ১২ শতাংশ বেশি ভোট দেখে জ্যোতি বসু প্রমাদ গুণেছিলেন। তাই তিনি (প্রয়াত) সীতারাম কেসরীকে দিয়ে কংগ্রেস থেকে আপনাকে বার করেছিলেন। আর আপনি জন্ম দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসকে। কংগ্রেসের বিপদে বারবার কমুনিস্টরা সাহায্য করেছে আর কম্যুনিস্টদের বিপদেও কংগ্রেসিরাও সাহায্য করেছে। এ পুরানো কথা। এটা সবাই জানে। নিন্দুকে বলে "ফুটবল খেলায়" অফ সাইডে দাঁড়িয়ে থাকলে যেমন গোল হয় না। তেমনি আপনার দল ভোটের সময় মানে গোল দেওয়ার সময় 'অফ সাইডে' দাঁড়িয়ে গোল নষ্ট করে। তাই তো বামফ্রন্ট ৩২ বছর এখানে রাজত্ব করছে। এটা সত্য নয়তো?

তবে হ্যাঁ, একটা আশার কথা আপনাকে শুনিয়ে রাখি। ছোট বেলায় একটা কবিতা পড়েছিলাম। "বুঁদির কেল্লা"। তাতে ছিল, "মাটি দিয়ে বুঁদির মতো নকল কেল্লা পাতি"। এখন আর মাটি লাগবে না। দেখেছেন তো পুজোর সময় কত রকমের প্যাণ্ডেল হয়। বড়বড় মন্দিরের, রাজভবনের, রাজ বাড়ির প্রভৃতি। এবার আমরা একটা "রাইটার্স বিল্ডিং" করব। আপনি তার ভিতরে প্রবেশ করবেন। ব্যাস। এবার আর "নেভার" বলতে হবে না।

সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী আত্মবোধানন্দ

বৈষম্যের মাঝে সাম্যের দৃষ্টি, বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য স্থাপন, বিভেদের মাঝে মহামিলন প্রদর্শন, খণ্ডিত অস্তিত্বের মাঝে অখণ্ড-সত্তার অনুভূতি, বহুর মধ্যে এককে প্রতিষ্ঠা এবং বিচ্ছেদের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করাকেই বলা হয় সমন্বয়।

সমন্বয়ের কথা শুনলেই ধর্মের কথা মনে পড়ে যায়, কারণ, আজকের দিনে ধর্মের সঙ্গে সমন্বয় কথাটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ধর্ম যেমন মানুষকে সমন্বয়ের পথ দেখিয়েছে, তেমনি ধর্মকে কেন্দ্র করেই বিভেদ-বিচ্ছেদেরও সম্মুখীন হতে হয়েছে। জগতে অবতার-পুরুষরা অধর্ম বিনাশ করতে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং শান্তি স্থাপনার্থে সৃষ্টি করেছেন স্বধর্ম। এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে বহু ধর্মের। কিন্তু অবতার বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। তিনি নতুন কোনও ধর্ম সৃষ্টি করলেন না; পরন্তু প্রমাণ করলেন পূর্ব অবতারগণের সৃষ্ট সকল ধর্মই সত্য এবং সকল ধর্মের মধ্যে এক ঐক্য বিদ্যমান — একথা শ্রীরামকৃষ্ণ উপলব্ধি করেছেন, তাই তিনি সর্বধর্ম-সমন্বয়ক। তাঁর আদর্শগত অনুভূতলব্ধ বাণী : 'যত মত তত পথ'। অর্থাৎ সব ধর্ম মতই সত্য। এ এক অপূর্ব সমন্বয়বাণী — তাঁর অন্তরের অভ্যন্তর থেকে অঙ্কুরিত। সকল ধর্মকেই গ্রহণ করতে হবে, বর্জন নয়; সকল সাধন প্রণালীই সত্য — স্বামীজীর ভাষায় : 'Acceptance not mere tolerance.'

বিভিন্ন ধর্মমতের ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্র্য ও আপাত-বৈপরীত্যের মাঝখানে যে এক সুমহান ঐক্যতান বিরাজমান — তা শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়রূপ বীণায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে এবং প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁর ধ্যাননেত্রে। প্রতি ধর্মের মধ্যে সে সমন্বয়-বাণীর মূল-সুরটি নিহিত আছে — তা ঝঙ্কৃত হয়েছে তাঁর কর্ণ-কুহরে। সুতরাং, আপাত বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনে, স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সমস্যা-সমাধান করতে — সর্বোপরি সর্বধর্ম-সমন্বয়ের বাণী জগতে ঘোষণা করতেই তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

জগতে যে সকল কবি, মনীষী, সাহিত্যিক এসেছেন এঁদের প্রত্যেকেই ধর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মানব কল্যাণের কথা বলেছেন এবং যার দ্বারা সমন্বয়বিধান হয়, বিভেদভঞ্জন হয় তারই জন্য হয়েছেন সচেষ্ট। তৎসত্ত্বেও জগতে বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নতাবাদ, কুসংস্কার ও অধার্মিকতার প্রভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে; এবং তখনই আবির্ভূত হয়েছেন জগতের ধর্মাচার্যগণ — অধর্ম বিনাশার্থে এবং স্বধর্ম সংস্থাপন করতে। এভাবেই বিভিন্ন ধর্মবেত্তাগণ বিভিন্ন ধর্মের করেছেন সৃষ্টি। কিন্তু আশ্চর্য, প্রত্যেক ধর্মগুরুই স্বধর্মের মধ্য দিয়ে সমন্বয়সাধনে প্রয়াসী হয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধর্মবেত্তাগণের ধর্মাদর্শ সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রয়োজন।

প্রথমে ধরা যাক — রাজা শ্রীরামচন্দ্রের কথা। তিনি ছিলেন ত্রেতা যুগের অবতার। সত্যপরায়ণ, প্রজাবৎসল ও ধার্মিকতা তাঁর চরিত্রের অন্যতম উজ্জ্বল দিক। রাজসিংহাসন বিসর্জন দিয়ে তিনি সত্য-রক্ষার্থে বনবাস বরণ করেছিলেন। আবার রাজকর্তব্য পালনে প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য সহধর্মিণী সীতাকেও পর্যন্ত করেছিলেন পরিত্যাগ। ধর্মকে বাদ দিয়ে তিনি কোনও কাজ করেননি এবং শান্তি ও সমন্বয় স্থাপনের জন্যই এসকল কাজ করেছেন তিনি সকলের কল্যাণ কামনায়। আবার গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমন্বয়দৃষ্টি নিয়ে বলেছেন :

"সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।।" (৯।২৯)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে প্রকাশিত

— আমি সর্বভূতে সমভাবাপন্ন, আমার শত্রু ও মিত্র কেউ নেই, আমার প্রিয় ও অপ্রিয় কেউ নেই। তবে যারা আমায় ভক্তিসহকারে ভজনা করে, তারা যে জাতিরই হোক্-না-কেন, আমার মধ্যে তারা বিরাজ করে এবং আমিও তাদের মধ্যে বিরাজ করি। শ্রীভগবান-এর এই অভেদদৃষ্টিই সমন্বয়সেতু নির্মাণ করে। শ্রীভগবান আরও বলেছেন, — 'মানুষ নিজের পছন্দমতো যে পথ ধরেই এগিয়ে যাক-না কেন, শেষে সকলেই এক ভগবানের কাছেই পৌঁছায়।

ভগবান বুদ্ধের দৃষ্টিতে, — 'অহিংসা পরম ধর্ম।' তিনি বলতেন, — 'ঘৃণায় ঘৃণা দমিত হয় না, প্রেমই ঘৃণাকে জয় করতে পারে। আমাদের যারা ঘৃণা করে আমরা তাদের ঘৃণা না করে আমরা সুখে বাস করবো। প্রেম দ্বারা ক্রোধকে জয় করবো, সৎ দ্বারা অসৎকে জয় করবো।' সর্বজীবে প্রেম ও অহিংসার দ্বারা তিনি সমন্বয় সেতু নির্মাণ করেছিলেন।

মানবদরদী যীশুর দৃষ্টিতে, — 'ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়।' .... 'প্রত্যেক মানুষই ঈশ্বরের সন্তান। অপরকে দয়া করো, ঈশ্বর তোমাকে দয়া করবেন।' .....'শত্রুকে ভালবাসবে, যে তোমাকে অভিশাপ দেবে — তুমি তাকে আশীর্বাদ করবে; যে তোমাকে অত্যাচার করবে, তুমি তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে।' যীশুর মানবপ্রেমের স্রোতে সব ভেসে একাকার হয়ে গিয়েছিল। সকলকে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর ভালবাসায় রচিত হয়েছিল যোগসূত্র।

অনুরূপভাবে কনফুসিয়াস বললেন — 'মানুষকে ভালোবাসা মানবিকতা, মানুষকে বুঝতে পারা বিজ্ঞান।' মানবতার পূজারী কনফুসিয়াসের এ দর্শন একপ্রকার সমন্বয়-সাধনের মূর্তরূপ।

শঙ্করাচার্যের মতে — 'জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ।' অর্থাৎ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জগতের সমস্ত জীবের মধ্যেই আছেন ভগবান। এই অনুভবের মধ্যে সকলের সঙ্গে মিলন ঘটে।

আচার্য রামানুজ — 'জীব মাত্রেই ভগবানের দাস'। তাই তিনি মানুষের হৃদয়ে ভক্তিভাবে প্লাবিত করেছিলেন — 'ওঁ নমো নারায়ণায়' মহামন্ত্র দানের মাধ্যমে। সকলকে নারায়ণজ্ঞানে দেখতেন ও শ্রদ্ধা করতেন।

গুরু নানক ও শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদ মানতেন না। উভয়েই নাম-সংকীর্তনের মাধ্যমে ভক্তির প্লাবনে প্লাবিত করছিলেন মানুষের হৃদয়। নাম-মাহাত্ম্যেই রচিত হয়েছে সমন্বয় সেতু। জগতের ধর্মাচার্যগণ বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ধর্মাচারণ করেছেন। কিন্তু সকল ধর্মের উদ্দেশ্য একই — একথা শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বাস করতেন এবং সকল ধর্ম যে সত্য — তা তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন নিজ জীবনে। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ অনন্য সাধারণ।

ধর্মের মধ্যে আজকে আমরা যে গ্লানি দেখছি, তার মূল কারণ হল পাশ্চাত্যভাব গ্রহণ এবং ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ধর্মাদর্শ বর্জন। তাই স্বামী সারদানন্দজী লিখেছেন — "বিজ্ঞানসহায়ে মানবের বর্তমান জীবনপ্রসার মানবকে বিচিত্র ভোগসাধন লাভে সমর্থ করিলেও, তাহাকে শান্তির অধিকারী করিতে পারিতেছে না। পৃথিবীর এই অশান্তি ও হাহাকার কাহার প্রাণে নিরন্তর ধ্বনিত হইয়া তাহাকে সর্বভোগসাধন উপেক্ষাপূর্বক যুগোপযোগী নূতন ধর্মপথাবিষ্কারে নূতন পথে জীবন পরিচালিত করিতে মানবকে পুনরায় কে শিক্ষা প্রদান করিবে? সর্বধর্ম-সমন্বয় ভাবধারাকে সংস্থাপনের জন্য ত্যাগ ও তপস্যার মূর্তবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ যুগপ্রয়োজনেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁর অলৌকিক ত্যাগ, তপস্যা এবং কামগন্ধহীন পুণ্যচরিত্রের অনুসরণেই সর্বমানবের আত্যন্তিক শান্তি।"

সনাতন হিন্দুধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সনাতন ধর্ম সকল ধর্মের জননীস্বরূপা। কারণ সকল ধর্মের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে — তা সনাতন হিন্দুধর্ম থেকে আহৃত। কিন্তু এই ধর্ম যখন লোপ পেতে বসেছিল — তখনই শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন, ধর্ম-ধারণা দৃঢ় করতে — ধার্মিককে স্বপথে চালিত করতে। তিনি কোনও নতুন ধর্ম সৃষ্টি করেননি ঠিকই; কিন্তু 'সকল ধর্ম সত্য' — এই অভিনব মতবাদের প্রবর্তন করেন। এ জন্যই তিনি সর্বধর্ম সমন্বয়াচার্য।

ঈশ্বর পুরুষের রঙ্গরস

বৈদেহীনন্দন রায়

ঈশ্বর হাসেন। হাসেন ঈশ্বর পুরুষরাও। ঈশ্বর হাসেন দুবার। দুটি মানুষ একটা দড়ি নিয়ে একখণ্ড জমি মাপছে। বলছে ওটা তোমার, আর এটা আমার। তখন একবার। ডাক্তার মৃত্যুপথ যাত্রী রোগীর আত্মীয়দের যখন আশ্বাস দেয় — ভয় কি আমি তো আছি, ভাল করে দেব। তখন একবার।

ঈশ্বরপুরুষ অবশ্য হাসেন মোহগ্রস্ত মানুষের মূঢ়তা দেখে। সচেতন করেন তাদের সহজবোধ্য শ্লেষাত্মক হাস্য রসে। যে হাস্যরসে থাকে প্রজ্ঞার গাম্ভীর্য। সত্যের অনাবিল দীপ্ত আর জীবনের বাস্তবতা। তাঁদের রঙ্গ রসিকতা মোহগ্রস্ত মানুষের মানসিক ক্লৈব্য মোচনে। জীবনের প্রকৃত সত্যকে তাঁরা দেখেন ঐশী প্রজ্ঞার আলোকে। বিষয়াসক্ত মূঢ় মানবমনকে জাগ্রত করেন তাঁরা কৌতুকের কশাঘাতে। স্ফটিক স্বচ্ছ দুরন্ত হাস্যরসের স্নিগ্ধ স্রোতে। যা তাঁদের জীবনলীলায় নিত্যসঙ্গী। ঈশ্বর পুরুষদের সেই রঙ্গরসিকতাকে নিয়ে এই প্রতিবেদন।

কেমন ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সে উত্তর পাওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক এক বিদগ্ধ মানুষ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের আলোচনায়। তাঁর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন গীতোক্ত সেই অবতার পুরুষ। যিনি এসেছিলেন হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তা রূপে। ধর্মসংস্থাপন তাঁর আবির্ভাবের কারণ। ব্রহ্মবান্ধব বলেছিলেন — "যা আমরা আমাদের সাধনা ও শক্তিবলে পারি না, তাহাই তিনি কৃপা করিয়া সিদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। হিন্দুর জীবন্ত ও বহু ইতিহাস তাঁহার শ্রীচরণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সেই হিন্দুর আদর্শ ও হিন্দুর জ্ঞান ও শিক্ষাকে পুনরায় তিনি জীবনে পরিস্ফুট ও বেগবন্ত করিতে আসিয়াছিলেন।"

সাহিত্যিক প্রথমনাথ বিশীর অনুভূতি ছিল অন্যরকম। বলেছিলেন — "তিনি আমার চির পুরাতন বন্ধু। তাঁর কাছে সবকিছু খুলে বলা যায়। সবকিছু কনফেস্ করা যায়, তাঁর কাছে প্রবেশাধিকার পাননি এমন কেউ নেই। তিনি সংসারকে মজার রসে রসিয়ে দেখতেন। তাঁর কাছে এলে মানুষ না হেসে পারত না। গভীর রসের সঙ্গে হাসির রসের মিলন এ এক Rare Combination।

সত্যই তিনি ছিলেন রসের অসীম সাগর। রসিক চূড়ামণি। সংসারের দুর্বোধ্য জটিল বিষয়কে সহজাত রসবোধে সিক্ত করে প্রাঞ্জল ভাষায় ছড়িয়ে দিতে পারতেন সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে। জ্ঞানী-অজ্ঞানী, উচ্চ-নীচ সকলেই সমানভাবে উপভোগ করতেন সেই রসসিক্ত বস্তু। সেই রসালাপের কয়েকটি এখন উপস্থাপিত করা যাক্।

প্রসঙ্গঃ মানুষের অবস্থা

বদ্ধ জীব

প্রতিদিনের মতো দক্ষিণেশ্বরের উত্তর-পশ্চিমের আপন ঘরে পূর্বাস্য হয়ে রসের ঠাকুর শোনাচ্ছেন অমৃত কথা। যুক্ত করছেন কথার মধ্যে অপূর্ব রসানুভূতির অনুলেপন। মাস্টারমশাই (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত), রাখাল, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্ত অবাক বিস্ময়ে শুনছেন। কখনও বিস্ময়াভিভূত হচ্ছেন। কখনও বা উচ্চ হাস্যে কক্ষ ভরিয়ে তুলছেন। কখনও বা শব্দানুধাবনে হয়ে যাচ্ছেন তাঁরা স্তব্ধ।

ঠাকুর বলছেন — দেখ, বদ্ধ জীব ঈশ্বর চিন্তা করে না। যদি অবসর পায়, তাহলে আবোল-তাবোল ফালতু গল্প করে। নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা করলে বলে চুপ করে থাকতে পারি না, তাই বেড়া বাঁধছি। হয়তো সময় কাটে না, তাস খেলতে শুরু করে।

বদ্ধ জীবদের কোনওমতে হুঁশ আর হয় না। দুঃখ পায়, দাগা পায়, বিপদে পড়ে। তবু চৈতন্য হয় না। স্ত্রী মরে গেল, কি অসতী হল, তবু আবার বিয়ে করবে। ছেলে মরে গেল। শোক পেল। কদিন পর সব ভুলে গেল। ছেলের যে মা শোকে অধীর হয়েছিল, কিছুদিন পর চুল বাঁধলো, গয়না পড়লো। এরকম লোক মেয়ের বিয়েতে সর্বস্বান্ত হয়, আবার বছর বছর তাদের ছেলে-মেয়েও হয়। মোকদ্দমা করে সর্বস্বান্ত হয়, আবার মোকদ্দমা করে। যা ছেলে হয়েছে খাওয়াতে পারে না। আবার বছর বছর ছেলে হয়।

কেশব সেনের এক আত্মীয়কে দেখেছিলুম। পঞ্চাশ বছর বয়েস। দেখি তাস খেলছে। যেন ঈশ্বরের নাম করার সময় নেই।

বদ্ধ জীবেরা সামনে হরিকথা হলে সেখানে থেকে চলে যায়। বলে হরিনাম মরবার সময় হবে। এমন কেন? আবার মৃত্যু শয্যায় শুয়ে আছে। ছেলে-মেয়ে তার পরিবারকে (স্ত্রী) বলছে, প্রদীপে অত সলতে কেন? একটা সলতে দাও। না হলে তেল পুড়ে যাবে।

মৃত্যুকালে বদ্ধ জীব সংসারের কথাই বলে। বাইরে মালা জপলে, গঙ্গাস্নান করলে, তীর্থে গেলে কি হবে। সংসার আসক্তি ভিতরে থাকলে মৃত্যুকালে সেটা দেখা দেয়। কত আবল-তাবল বকে হয়তো। বিকারের ঘরে হলুদ, তেজপাতা, বলে চেঁচিয়ে ওঠে।

অহঙ্কার

এবার মানুষের অহঙ্কারকে নিয়ে পড়েছেন ঠাকুর। বলছেন — দেখো, জীবের অহঙ্কারই মায়া। অহঙ্কারে জীবের উপাধি (চরিত্র) বদলে যায়। যে কালো পেড়ে কাপড় পরে আছে, অমনি দেখবে তার মধ্যে নিধুবাবুর তান (টপ্পার তান) এসে জোটে। আর তাস খেলে। বেড়াতে যাবার সময় হাতে ছড়ি নিয়ে চলে। রোগা লোকও যদি বুট জুতো পরে, সে অমনি শিস্ দিতে শুরু করে। সিঁড়ি ওঠার সময় সাহেবদের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। হাতে যদি কলম থাকে, কাগজ-টাগজ পেলেই অমনি ফ্যাসফ্যাস করে টান দিতে থাকবে।

দেখবে টাকাতেও অহঙ্কার আসে। টাকা হলে মানুষ আর একরকম হয়ে যায়। সে

(এরপর ১২ পাতায়)

কোন পথে আজকের ভারতীয় নারী

মুনমুন বিশ্বাস

পাঞ্চালীর মা তাকে তথাকথিত আধুনিক কায়দায় বড়ো করেছেন। তিনি নিজেও উগ্র আধুনিকা। কিন্তু পাঞ্চালীর হাবে ভাবে পোশাকে পশ্চিমী ফ্যাশনের অনুকরণ থাকা সত্বেও, সে বারবার তার

বন্ধুর মায়ের পরণের শাড়ি, শাঁখা-সিঁদুর দেখে আপ্লুত হয়ে বলতো "জানো কাকীমা, আমার মাকেও কতবার বলেছি শাড়ি পরতে, শাঁখা-সিঁদুর পরতে। কিন্তু মা বলেন, তিনি ওসব "Carry" করতে পারেন না।"

পাঞ্চালী কোনও কাল্পনিক চরিত্র নয়, সে আমারই পরিচিতা এক তরুণী — আজকের ভারতবর্ষের শহরাঞ্চলে এইরকম হাজার হাজার পাঞ্চালী শাঁখা-সিঁদুরধারী, শাড়ি পরিহিতা, হাতে সন্ধ্যা প্রদীপ নিয়ে দাঁড়ানো সেই ঐতিহ্যশালী মাতৃমূর্তিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

একবিংশ শতকের প্রথম দশকের শেষে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিশ্বায়ণের জোয়ারে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বেনো জলের অনুপ্রবেশে ছিন্ন হতে চলেছে ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্য ও পরম্পরার শিকড়। গৃহস্থের সন্ধ্যা প্রদীপের আলো আজ ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

মঙ্গল- শঙ্খধ্বনির রেশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। আধুনিকতার ভড়ং হিসাবে শাড়ি সালোয়ার ত্যাগ করে, ভারতীয় বধূ অঙ্গে ধারণ করছেন জিনস্, টি-শার্ট, ত্যাগ করছেন তার আয়েস্ত্রী শক্তির প্রতীক শাঁখা-সিঁদুরকে। হারিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় রমণীর কল্যাণময়ী মাতৃস্বরূপিণী মূর্তি — যে মূর্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে সন্তান-সত্যের অপলাপ করতে ভয় পেতো।

রাষ্ট্র ও সমাজের ক্ষুদ্রতম একক পরিবার। আর পরিবারের শোভা, সৌন্দর্য ও শান্তির রূপকার নারী। নারীই তাদের মায়া মমতা ভালোবাসা দিয়ে বেঁধে রাখেন পরিবারের একতাকে। পারিবারিক সৌহার্দ্যের ঐক্যতানের পরিবেশে বেড়ে

ওঠা শিশুমনের চেতনাতে ধরে রঙ, মানবিক ধর্মে আসে পরিশুদ্ধতা, স্নেহশীলতা ও শালীনতার আধার রূপে যে ভারতীয় নারী বিশ্বের দরবারে পরিচিত, সেই নারীত্বের ঐতিহ্য তার মমতাময়ী রূপ ক্রমশ যেন মলিন হয়ে যাচ্ছে।

ভোগবাদের প্রসারের ফলে সর্বংসহা নারীর সহনশীল শক্তি বিপণনের চোরাবালিতে যেন ডুবে যেতে চলেছে। প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রসাধনী বিলাসসামগ্রী, আসবাবপত্র কিনতে না পারলে, আজকের গৃহিণীদের যেন সমাজে মর্যাদা থাকছে না। সিনেমা, টি ভি সিরিয়াল, বিজ্ঞাপন মানুষের বস্তুবাদী ভোগবাদী মনোভাবকে আরও উসকে দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রীর প্রতি কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করে। তথাকথিত 'আধুনিক' পশ্চিমী ফ্যাশানের হাতছানিতে লোভনীয় বিপণনের দুনিয়ায় আজকের নারী তার সৌন্দর্য ও শালীনতাকে যেন সওদা করতে চলেছে। স্বল্পবসনা নারী ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড-এর র‍্যাম্পে হয়ে ওঠে— মোহময়ী, কামময়ী রূপী।

কল্যাণময়ী মাতৃমূর্তি ঐশ্বর্যশালী, কিন্তু মোহময়ী নারীমূর্তি ধ্বংসের। এই মোহময়ী মূর্তিই যুবসমাজকে করছে বিপথগামী, উচ্ছৃঙ্খল, ধর্ষণকারী।

আবার গৃহিণীদের বস্তুবাদী ভোগ্যপণ্যের চাহিদা যদি গৃহকর্তা পূরণ না করতে পারেন, তবে গৃহে শুরু হয় কুরুক্ষেত্র — বিনষ্ট হয় সংসারের শান্তি। সেই অশান্তির বিষবাষ্পে বেড়ে ওঠা শিশুর মন পরিপূর্ণ হয় বিষাদের রাগিণীতে এবং মায়ের ভোগবিলাসের সেই প্রবণতা সঞ্চারিত হয় শিশুমনে। তাই বর্তমান প্রজন্ম যেন অল্পে তুষ্ট নয়। আসলে মার শিক্ষা-রুচি-চিন্তা দ্বারাই প্রভাবিত হয় শিশুমন। কিন্তু যে মার হাত ধরে শিশুর পথচলা শুরু হয়, সেই মা যদি কর্মরতা হন এবং তাকে যদি দিনের বেশিরভাগ সময় গৃহের বাইরে কাটাতে হয়, তবে সন্তান-সন্ততিরা অনেক ক্ষেত্রে মায়ের স্নেহশীলতল ছায়া থেকে বঞ্চিত হয়। আর বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত মহিলাদের অবকাশ নেই বললেই চলে — কোনও কোনও দিন বারো থেকে ষোলো ঘন্টাও তাদের অফিসে থাকতে হয়। তাছাড়া একান্নবর্তী পরিবারের প্রথা ভেঙে যখন থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের নাগরিকের মতো "Nuclear Family''তে বসবাস করতে শুরু করেছি, তখন থেকে ঠাকুমা, দিদিমা, কাকীমাদের স্নেহসুধাধারা থেকেও সেই শিশুরা বঞ্চিত হয়েছে।

অপরদিকে জগতের কর্মযজ্ঞে পুরুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের পাশাপাশি অন্দরমহলে নিজের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই সম্পর্কের ঠাসবুনোনের সুতোয় টান ধরাচ্ছেন আজকের রমণীরা। প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে বিবাহ বিচ্ছেদের মতো ঘটনা। এই দগ্ধ সম্পর্কের মাঝে বেড়ে ওঠা ছেলে-মেয়েরাই গুরুজনদের শ্রদ্ধা করতে ভুলে যায়, ভাই-বোনদের ভালোবাসতে ভুলে যায়, পরিবারের সকলের সুখ-দুঃখের শরিক হওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তাদের মনে শুধু জমা হয় ঘৃণা-হিংসা-বিদ্বেষ, প্রতিশোধের স্পৃহা অথবা নারীজাতির প্রতি অবজ্ঞা। জতুগৃহে বেড়ে ওঠা এই ছেলে-মেয়েরাই ভালোবাসাকে খুঁজতে গিয়ে অনেক সময় হারিয়ে যায় অন্ধকারের চোরাগলিতে, লিপ্ত হয় বিভিন্ন অসামাজিক কাজে, আপন করে নেয় মাদক দ্রব্যকে। কিন্তু সংসারে নর-নারীর সম্বন্ধ শুধু স্থূল দিন যাপনের গ্লানির সম্পর্ক নয়, মানসিক উৎকর্ষে, মননে-চিন্তনে দুজনে-দুজনের পরিপূরক। প্রতিযোগিনী নয়, সহযোগিনী। অসম সম্পর্কের দীনতা নয়, সুষম সম্পর্কের মাধুর্যের দ্বারাই ক্ষুদ্রগৃহ হয়ে ওঠে স্বর্গের নন্দন কানন। সুপ্রাচীন এই ভারতীয় জীবনযাপনের ধ্যান-ধারণা, জাতিসত্ত্বা ও ঐতিহ্য আজ এক গভীরতর সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। পাশ্চাত্য নারীবাদী তত্ত্ব প্রাচ্যের সভ্যতাগুলির ক্ষেত্রে কতটা প্রাসঙ্গিক তার সঠিক মূল্যায়ণ এখনও হয়নি।

আমাদের শিক্ষা পাঠক্রমের মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্য বা মূল্যবোধ স্থান পায় না। ফলে যে পথে এগিয়ে চলছে বর্তমান প্রজন্ম সেই প্রেমহীন, ভালোবাসাহীন স্নেহ-মায়ামমতাহীন পথের শেষ প্রান্তে পৌঁছে দেখবো প্রকৃতি ও পার্বতী সমগ্র বিপরীত সত্তায় স্থিত হয়ে, তাদের সৃষ্টিকেই গ্রাস করার জন্য উদ্যত। তাই বর্তমান প্রজন্মের যুবক- যুবতীরা সন্ধ্যা প্রদীপের শান্ত আলোর দিশা না পেয়ে, বেছে নিচ্ছে নাইট ক্লাবের উগ্র আলোকে! মঙ্গল শঙ্খের ধ্বনি শুনতে না পেয়ে বেছে নিচ্ছে ডিস্কো থেকের অনুরণন! এই লক্ষ্যহীন, দিশাহীন বিপথগামী যুব সমাজকে ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন সামাজিক তথা-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলিকে আরও সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে। গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপনের অশ্লীলতার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। সরকার যখন বড় পর্দায় ধূমপানের দৃশ্যকেও নিষিদ্ধ করতে পারে, তখন টিভিতে, সিনেমা, সিরিয়ালে, বিজ্ঞাপনে অশ্লীল দৃশ্যের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নিতে পারে না কেন? চাই শিক্ষাব্যবস্থার ভারতীয়করণ, পাঠক্রমে যোগশিক্ষা, মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি। এইভাবেই ভারতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং পরম্পরাকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে আমাদের প্রত্যেককে সৈনিকের ভূমিকা ধারণ করতে হবে।

ত্রিপুরার সন্ত

শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস গোস্বামী

ডঃ জগদীশ গণ-চৌধুরী

শ্রীল শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস গোস্বামী প্রভু পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পারিবারিক পরিচয় সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তিনি কৈবর্তদাস সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং ৪৪ বৎসর বেঁচেছিলেন। তাঁর আয়ুষ্কাল আনুমানিক ১৯৩৪ থেকে ১৯৭৮ খৃস্টাব্দ। তিনি অল্প বয়সে পিতৃহারা হন। বাল্য শিক্ষা অবধি পড়াশুনা করেন।

ত্রিপুরার পশ্চিম প্রান্তে, পূর্ব বঙ্গের পূর্বতম প্রান্তে কসবা ও মোগড়া নামক জনপদ অবস্থিত। কসবা ও মোগড়ার মাঝামাঝিতে গোঁসাইস্থলী ও মণি অন্ধ নামক দুইটি গ্রাম বিদ্যমান, গোঁসাইস্থলীতে সনাতন গোস্বামীর আশ্রম ও সমাধিস্থল আছে। মণি অন্ধে জন্ম গ্রহণ করেন সুরেন্দ্র সাধু। সুরেন্দ্র সাধু গোঁসাইস্থলীতে সনাতন গোস্বামীর আশ্রমে যেতেন, সাধন-ভজন করতেন। তৎকালে সনাতন গোস্বামী জীবিত ছিলেন না। সুরেন্দ্র সাধুর আশ্রমিক নামক শ্রীশ্রী ঠাকুর হংসরাজ সোহংমনি। হংসরাজ কনিষ্ঠ কৃষ্ণদাসকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। সুরেন্দ্র সাধু যখন সনাতন গোস্বামীর আশ্রমে যেতেন, তখন কৃষ্ণদাস সেই আশ্রমে নবাগত ব্রহ্মচারী মাত্র।

১৯৬৪ খৃস্টাব্দে পূর্ব-পাকিস্তানে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়। তাতে হাজার-হাজার হিন্দু নিহত হয়। হিন্দু নারী নির্যাতিত হয়। মঠ-মন্দির আক্রান্ত হয়। সেই সময় অতি কষ্টে সুরেন্দ্র সাধু ও কৃষ্ণদাস গোস্বামী আগরতলায় আশ্রয় নেন। তখন প্রবীণ ও মৌনী সুরেন্দ্র সাধু আগরতলা নগরের ভট্টপুকুর নামক গ্রামে, এক ভদ্রলোকের বাড়িতে কিছু দিন অবস্থান করেন। তখন নবীন কৃষ্ণদাস আগরতলায় ইতঃস্তত ঘুরছেন, কোথাও আশ্রম পাননি। কৃষ্ণদাস তখন প্রায়ই সুরেন্দ্র সাধুর নিকট ভট্টপুকুর যেতেন।

আগরতলা নগরের কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে আমতলী নামক জনপদ অবস্থিত। এই গ্রামের অধিবাসীদের অনেকেই গোঁসাইস্থলী থেকে আগত বাঙালি হিন্দু। এই গ্রামের প্রাচীন বাসিন্দা হলেন হরেন্দ্র রায়। হরেন্দ্র বাবু ধনাঢ্য ও ধার্মিক ব্যক্তি এবং কৃষ্ণদাস অপেক্ষা বছর দশেক বড়। হরেন্দ্রবাবুর বাড়িটির অবস্থান একটি পুকুরের উত্তর পাড়ে। পুকুরটির নাম হল কুবির দীঘি। খই, চিড়া, মুড়ি ভেজে বিক্রয় করা যাদের

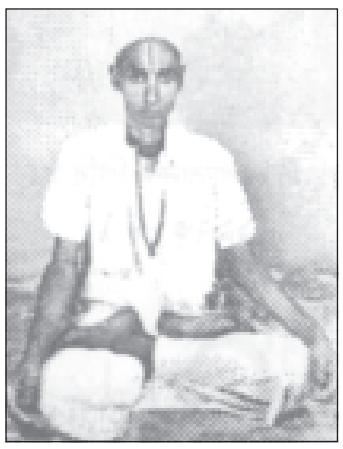

স্বামী কৃষ্ণদাস মহারাজ।

কৌলিক বৃত্তি-তাদের বলা হয় কুরি। হরেন্দ্র বাবুর বাড়ির আয়তন বিশাল। তিনি চাইলেন দীঘি সমেত দক্ষিণাংশে একটি আশ্রম স্থাপন করতে। এই উদ্দেশ্যে গ্রামবাসীদের সাথে পরামর্শ করেন।

গোঁসাইস্থলীতে প্রতি বৎসর ১ বৈশাখ মেলা বসতো। অতি প্রাচীন এই মেলা। দেশ ভাগের পর হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হল, সীমান্ত অতিক্রম কষ্টকর হল। ওই মেলায় ত্রিপুরা থেকে বহু ত্রিপুরী, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রিয়াং সম্প্রদায়ভুক্ত পাহাড়ী ভক্তরা যেত। দেশভাগের পর তাদেরও মনোবাঞ্ছা জানলেন হরেন্দ্রবাবু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তারা ১৯৫০ খৃস্টাব্দে কুরির দীঘির পাড়ে— বৈশাখী মেলা প্রবর্তন করলেন।

পাহাড়ী-বাঙালি এই উভয় অংশের ভক্তদের কথা ভেবে হরেন্দ্রবাবুরা সুরেন্দ্র সাধুকে আমন্ত্রণ জানালেন, আমতলীতে আশ্রম গড়তে। সুরেন্দ্র সাধু প্রথমে পাঠালেন শান্তমনি সরকারকে জায়গায় দেখে নিতে। পরে স্বয়ং এলেন সুরেন্দ্র সাধু। তিনি দেখে নীরবে চলে গেলেন। নির্দিষ্ট সময়ে দন্ডায়মান শতাধিক লোকের সাথে কথাও বলেননি। মহাসড়কের নিকটবর্তী কোলাহলময় স্থান তাঁর পছন্দ নয়। তিনি কৃষ্ণদাস গোস্বামীকে বললেন, আমতলীতে আশ্রম গড়তে।

অতঃপর শুরু হল আশ্রমগড়ার কাজ। বনকাটা, মাটির দেওয়াল, পাতিটিনের ঘর নির্মাণ হল। ১৩৮৩ বাংলাতে অর্থাৎ ১৯৭৬ খৃস্টাব্দে নির্মিত হয় পাকা সমাধি মন্দির। গোঁসাইস্থলী থেকে মাটি এনে সনাতন গোস্বামী সমাধি মন্দির গড়া হল। আশ্রমের নাম হল সনাতন গোস্বামীর আশ্রম।

কৃষ্ণদাস গোস্বামীর চেহারা ছিল পাতলা, লম্বা কালো, আজানুলম্বিত হাত ছিল। শুভ্র পোশাক পরিধান করতেন। মস্তক মুন্ডিত ছিল, নিরামিষ ভোজন করতেন। গল্পগুজব করতে, হাসি-তামাসা করতে ভালবাসতেন। কিন্তু পাকস্থলীর প্রদাহ রোগে কষ্ট পেতেন। আগরতলায় মহারাজগঞ্জ বাজারে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কীর্তন হয়। তাতে তিনি আসতেন। এমনই একবার কীর্তনে এসে তিনি অসুস্থ হন, পেটে অস্ত্রোপচার হয়। কিন্তু মারা যান।

ঈশ্বর পুরুষের রঙ্গরস

(১১ পাতার পর)

আর মানুষ থাকে না।

এখানে (দক্ষিণেশ্বর) এক ব্রাহ্মণ যাওয়া আসা করত। বাইরে সে বেশ বিনয়ী। কিছুদিন পর আমরা কোন্নগর গেলুম। হৃদে সঙ্গে ছিল। নৌকা থেকে যাই নামছি, দেখি সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গাধারে বসে। আমাদের দেখে বলল — কি ঠাকুর, বলি আছো কেমন। শুনে হৃদেকে (হৃদয়) বললুম — ওরে হৃদে, লোকটার টাকা হয়েছে। তাই এরকম কথা। হৃদে হাসতে লাগল।

দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে একটি মেথরাণী ছিল। কী অহঙ্কার তার। তার গায়ে ২/১ খানা গয়না ছিল। সে যে পথ দিয়ে আসছিল, সেই পথে দু'একজন লোক পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। মেথরাণী তাদের বলে উঠল, এই সরে যা। আসলে অলঙ্কারে গুমোর।

আবার দেখা যায় বিদ্যার অহঙ্কার, পান্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, তাদের জ্ঞান হয় না। এসব লোককে যদি বলা হয় অমুক জায়গায় একটি সাধু আছে। দেখতে যাবে? অমনি নানা ওজর করে তারা বলে, যাব না। আর মনে মনে বলে, আমি এত বড় লোক, আমি যাব!

সূত্র : শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চে র হস্তাক্ষর সংগ্রহ অভিযান

সংবাদদাতা ।। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি পশ্চি মবঙ্গ প্রদেশের জন্য 'জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চে র' রাজ্য সমিতি গঠন করা হয়। জনজাতি সমাজের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধার বিষয় নিয়ে এই সমিতি চিন্তা ভাবনা করবে। ১ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত সমিতি এক মাস ব্যাপী জনজাতি (Seleclule Tribe) সমাজের মানুষের কাছ থেকে হস্তাক্ষর সংগ্রহ অভিযান করবে।

এই অভিযানের উদ্দেশ্য : জনজাতি সমাজের যে সমস্ত মানুষ ধর্মান্তরিত হয়েছে, (১) তাদের জনজাতি স্বীকৃতি বাতিল করা হোক এবং (২) জনজাতি হিসাবে তাদের সরকারি সুযোগ সুবিধা বন্ধ করা হোক। এই হস্তাক্ষরের দাবি পত্র রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হবে। এই অভিযান সারা দেশ জুড়ে এক মাস ব্যাপী চলবে। সেইজন্য অখিল ভারতীয় স্তরে এবং প্রতিটি রাজ্য স্তরে সমিতি গঠিত হয়েছে। এভাবে জেলা ও ব্লক স্তরে সমিতি গঠন করা হবে।

পশ্চি মবঙ্গ সমিতির জন্য আশিস টুডু — সভাপতি, সুনীল হেমব্রম — সহ সভাপতি, মনীন্দ্রনাথ মুরমু — সম্পাদক, প্রশান্ত মুখার্জ্জী — সহ সম্পাদক, অমরেন্দ্রনাথ সুবরা ও গৌরচন্দ্র মুখার্জী— সংযোজক, দেওয়ান হেমব্রম, ভৃগুরাম মাঝি, শুকদেব টুডু, রতন সরদার, সূর্যনারায়ণ মানকি, বিশ্বনাথ বিশ্বাস প্রমুখ ব্যক্তিগণ সমিতির সদস্য হিসাবে কাজ করবেন।

এই সমিতির প্রান্তীয় কার্যালয়ের ঠিকানা ঃ 'জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ', প্রযত্নে - গৌরচন্দ্র মুখার্জী, গ্রাম ও ডাক - মসিনা, ঝালদা, পিন ৭২৩২০২, জেলা - পুরুলিয়া, ফোন নং ৯৪৩৪৮৮২০২৩।

কৃষিকে বাদ দিয়ে বিকল্প কর্মসংস্থানের পথে কৃষক সভা কেন ?

(৩ পাতার পর)

কুখ্যাত। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে পূর্বে যে জমির মালিক ছিল কৃষিকার্যরত খোদ কৃষক, ব্যক্তি মালিকানা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে এবার থেকে জমিদাররা অর্থের জোরে ইচ্ছে মতো জমি ক্রয়, বিক্রয়, বিলি ব্যবস্থা সব কিছু করারই অধিকার লাভ করল। যেহেতু কমিউনিস্ট চরিত্র সম্পর্কে এই লেখাটি লিখতে বসেছি, তাই জানিয়ে রাখি বৃটিশ প্রবর্তিত এই ভূমি-বন্দোবস্ত আমাদের দেশে প্রথম বুর্জোয়া বাজার অর্থনীতি ও মুদ্রা সঞ্চা লন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল। আর এটাকেই আমাদের কমিউনিস্ট দের গুরু মশাই মার্কস্ সাহেব "এশিয়ার বৃহত্তম ও একমাত্র বিপ্লব" হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এভাবেই বৃটিশ সরকার এদেশের গ্রাম্য সমাজ ব্যবস্থার চিরাচরিত ভোগ-দখলের অধিকার কেড়ে নিয়ে সমাজকে অর্থের নিরীখে ধনী-দরিদ্র শ্রেণীতে ভাগ করে দিল। তারই সুফল নিল সামাজিক বৈষম্য ও অসাম্যের শিকারী সাম্যের ধবজাধারী ও শ্রেণী-সংগ্রাম লাগানোর কারবারী কমিউনিস্টরা। ভূমি-সংস্কারের বাগাড়ম্বরকারী কমিউনিস্টরা যে এতদিন গ্রাম্য কৃষি ও কৃষকের কোনও মৌলিক উন্নয়ণ করেনি তা বোঝাতে এটুকু প্রেক্ষাপটের অবতারণা করতে হল। আসলে কমিউনিস্ট দের ঘোষিত নীতিই হল রাষ্ট্রক্ষমতা দখল, আর কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা— যার ভিত্তি হল একনায়কতন্ত্র শ্রমিক কৃষক শ্রেণীর নাম করে কিছু শিক্ষিত ধূর্ত পরজীবী মানুষের একনায়কতন্ত্র, ঠিক যেমনটি সাধারণ সরল মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে কিছু মৌলবাদী মুসলমানরা গঠন করে ইসলাম রাষ্ট্র। পরে নিপীড়নের মধ্য দিয়ে সকলের কণ্ঠরোধ।

আজ এরাই ভীড় শুরু করেছে বিকল্প কর্মসংস্থানের। কী সেই বিকল্প কর্মসংস্থান ? শিল্প স্থাপনের নামে নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুরে কৃষকদের জোর করে ফসলি জমি থেকে উচ্ছেদ করে যে কর্মসংস্থানের কথা প্রচার করেছিল তাতে বাধা পেয়ে আজ এরা "বিকল্প কর্ম সংস্থানের" নয়া চাল চালছে। কৃষি আজ আর ওদের কাছে লাভজনক নয়, শিল্প গড়লে জমিও বেচা যায় আবার প্রমোটারী করে কিছু কামানোও যায়। তাই সি পি এমের পলিটব্যুরো সদস্য বরদারাজন আবিষ্কার করেছেন যে "দেশের ৪২ শতাংশ কৃষক আর কৃষিকাজ করতে চাইছেন না। কারণ কৃষি আর আগের মতো লাভজনক নয়"। কেন নয় ? কী এর কারণ সেটাই আবার আলোচনা করব।

হরেকৃষ্ণ কোঙারের কথা দিয়ে শুরু করি। "কেবলমাত্র চাষীদের স্বার্থের অনুকূলে যদি ভূমিসত্বের সংস্কার হয়, তাহলেই শুধু বিনাবাঁধায় কৃষির উন্নতি হতে পারে।" এই যদিটাই হচ্ছে আসল সত্য ও সদিচ্ছার প্রতীক। আগেই বলেছি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করাটাই যাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তাদের কাছে উন্নতি আশা করা আর মুর্খের স্বর্গে বাস করা একই। পৃথিবীর কোথাও কমিউনিস্টরা আজ পর্যন্ত কোনও সামাজিক উন্নয়ণ ঘটিয়েছে এমন উদাহরণ নেই। পশ্চি মবঙ্গেও নেই। এদেশের কৃষির ইতিহাস আধুনিক বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের চেয়েও বহু প্রাচীন। এই প্রাচীন ইতিহাসের পাতায় এই বঙ্গেরই এক প্রাচীন সন্ন্যাসী সেই যুগেও যে কৃষিজ্ঞানের স্বাক্ষর রেখে গেছেন তার তুলনা নেই। সেই যুগে বসেও স্বামীজী বুঝেছিলেন যে এদেশের কৃষির দুর্দশার মূল কারণ কৃষকের নিরক্ষরতা, প্রকৃতির উপর অত্যাধিক নির্ভরতা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত জমি চাষ এবং অনুন্নত বিপণন ব্যবস্থা। তিনি সেই কালেও কৃষির আধুনিকীকরণ চেয়েছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্যের অনুকরণে নয়, সম্পূর্ণ ভারতীয় বৈদান্তিক মন দিয়ে অর্থাৎ মানবিক মূল্যবোধ দিয়ে। স্বামীজী কৃষিকে সব সময় "প্রাথমিক ক্ষেত্র" বলে উল্লেখ করেছেন। শিল্পকে উল্লেখ করেছেন 'অপ্রধান বা গৌণ ক্ষেত্র" হিসাবে। তাঁর মতে প্রাথমিক ক্ষেত্রকে উন্নত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে কৃষি ও বাণিজ্যকে আধুনিকীকরণ করা।

পশ্চি মবঙ্গের কমিউনিস্টরা ৩২ বছর ক্ষমতায় থেকেও কৃষিতে বাণিজ্যকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রযুক্তিকরণ এবং বিপণনের সুস্থ প্রতিযোগিতার কোনও ব্যবস্থাই গড়ে তোলেনি। এখনও এখানকার আলু চাষীরা ফলন বেশি হলে চিন্তায় পড়ে। ফোড়েরা সময় মতো আলু না কিনে আলু অস্বাভাবিক কম দামে বিক্রি করতে চাষীকে বাধ্য করে। চাষী যখন উৎপাদন ব্যয়েরও কম দামে আলু বিক্রি করতে বাধ্য হয় তখন তারা আত্মহত্যা করে। সরকারি মতেই ২০০৬ সালে আত্মহত্যা করেছিল পশ্চি মবঙ্গে ১,১৮৯ জন চাষী, কেরলে ১,১২৪ জন। গত বছর ২৫০ টাকা কুইন্টাল দরে এক লাখ টন আলু কেনার কথা ছিল পশ্চি মবঙ্গ সরকারের। কিন্তু গড়িমসি করে করে কোল্ড স্টোরেজ বন্ধ হওয়ার মাত্র চারদিন আগে (২৭ মার্চ ০৮) কিনতে মাঠে নামে। ইতিমধ্যে শিলা বৃষ্টিতে মাঠের আলু নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে চাষীরা কম দামে আলু বিক্রি করতে বাধ্য হয়। সেবার ৮৪ লাখ টন আলু হয়েছিল। পরে বামপন্থী সরকার বেসরকারি ব্যাপারীদের কাছ থেকে আলু কিনেছিল।

এইভাবে কৃষিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ধবংস করার অনেক উদাহরণই দেওয়া যেতে পারে। তাই বরদারাজন বলেছেন, কৃষকরা আর কৃষিকাজ করতে চাইছে না— একথা মোটেই ঠিক নয়। আজ থেকে ১০০ বছরেরও আগে যে কথাটি বলেছিলেন ড. রমেশ চন্দ্র দত্ত সে কথাটি কমিউনিস্ট দের ক্ষেত্রে কতটা প্রযোজ্য তা উল্লেখ করলেই পাঠক বুঝতে পারবেন। তিনি বলেছিলেন, "ওইসব শাসকগণ ক্ষমতা দখল করেই এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যা কৃষকদের নিজেদের ভাল-মন্দ বিচার করার মনোবলও ভেঙ্গে দেয়।" স্বামী বিবেকানন্দও বলেছিলেন, "সমস্ত ব্যবস্থার, সে সামাজিক হোক, কিংবা রাজনৈতিক সফলতা নির্ভর করে মানুষের সহৃদয়তার উপর। আমাদের এই মন নিয়ে গ্রামে যাওয়া উচিত নয়, যে আমরা কৃষকদের উপকার করতে এসেছি। বরং এই মন নিয়ে যাওয়া উচিৎ যেন ঈশ্বরই আমাদের এই সুযোগ দিয়েছে।"

কৃষিক সঙ্গে শিল্পের উন্নতি অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু তা কৃষির সমৃদ্ধি র জন্য। কৃষিকে ছেড়ে শিল্প গড়ে উঠতে পারে না। কারণ শিল্পের জন্য কাঁচামাল কৃষি থেকেই আসবে। স্বামীজী উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হবে ধীরে ধীরে স্বল্পমেয়াদী আন্তরিক পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে প্রাথমিক ক্ষেত্রের উন্নতি ঘটিয়ে দেশের শিল্পায়ন ঘটানো। কারণ তিনি জানতেন প্রাথমিক ক্ষেত্র আর অপ্রধান ক্ষেত্র একই সঙ্গে সংবদ্ধ। কৃষি যেমন শিল্পের জন্য সরবরাহ করতে পারে, ঠিক তেমনি শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারও সৃষ্টি করতে পারে। তাই কৃষিকে বাদ দিয়ে বিকল্প কর্মসংস্থান নয়। কৃষিকে উন্নত করে গ্রামীণ কৃষিজাত দ্রব্যের শিল্প গড়ে তুলতে হবে। তাতে কৃষিও বাঁচবে শিল্প তার বাজার পাবে। স্বামীজী চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন যে "শাস্ত্র পড়ে দেখ, জনক ঋষি এক হাতে লাঙ্গ ল দিচ্ছেন আর এক হাতে বেদ অধ্যয়ণ করছেন। ....আমেরিকা চাষবাস করেই এত বড় হয়েছে।" কবিগুরুও বলেছিলেন, "মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের মধ্যেই, প্রাণের নিকেতন লক্ষ্মী এইখানেই তাঁহার আসন সন্ধান করেন।" আবার গান্ধিজীও বলেছেন, "গ্রামগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলে ভারতবর্ষও নিশ্চি হ্ন হবে।"

সমাজ সেবা ভারতীর প্রাদেশিক প্রশিক্ষণ বর্গ

সেবা ভারতীর স্মারক গ্রন্থ উন্মোচন করছেন শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ।

সংবাদদাতা ।। গত ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি দুর্গাপুরে সমাজ সেবা ভারতী পশ্চি মবঙ্গ-এর প্রাদেশিক প্রশিক্ষণ বর্গ হয়ে গেল। ১৬ জন মহিলা সহ ১৫০ জন বর্গে উপস্থিত ছিলেন।

৭ ফেব্রুয়ারি সকালে রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতীর সংগঠন সম্পাদক সুন্দর লক্ষ্মণনজী ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ প্রদানের মাধ্যমে বর্গের সূচনা করেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ উদ্বোধনী ভাষণ দেন। কর্ণাটক থেকে আগত হিন্দু সেবা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশক (Director) শ্রীধর সাগরজী কর্ণাটকের সেবা কাজের বিবরণ দিয়ে বলেন, সেবা প্রতিষ্ঠানের ৪ জন শিশু আমেরিকা Olympic যাওয়ার জন্য মনোনীত হয়েছে। তিনি আরও জানান, বাঙ্গালোরে বিকলাঙ্গদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাবী সেবা কাজ আছে। সঙ্ঘের সহ পূর্ব ক্ষেত্র প্রচারক অজিত প্রসাদ মহাপাত্র মূলতঃ সেবা কাজের সাংগঠনিক দিক পর্যালোচনা করেন। পূর্বক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার গ্রাম বিকাশের কথা প্রসঙ্গে বলেন, Collective unit of the professional group হচ্ছে গ্রাম। এদের সহযোগিতা যদি বৃদ্ধি করা যায়, তাহলে গ্রামের উন্নতি হবে। তপস্যার মাধ্যমে সমাজের সেবা এবং সেবাকে সাধনা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। সমাপ্তি ভাষণে পূর্ব ক্ষেত্র প্রচারক সুনীলপদ গোস্বামী বলেন, সেবা মানে সার্ভিস নয়, সেবা মানে কর্তব্য, সেবা মানে প্রতিদান নয়, সর্বস্ব সমর্পণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সমাজ সেবা ভারতী পশ্চি মবঙ্গ-এর সভাপতি বিশ্বনাথ মুখার্জী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রান্ত সহ সেবা প্রমুখ মনোজ চট্টোপাধ্যায় পরিচালনা করেন। এছাড়া এই বর্গে উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত গ্রাম বিকাশ প্রমুখ শঙ্কর মিত্র, বিভাগ প্রচারকপঙ্কজ মন্ডল, জেলা কার্যবাহ বিপ্লব রায় এবং জেলা প্রচারক তরুণ মুখার্জী এবং সহ প্রান্ত সেবাপ্রমুখ দিলীপ আঢ্য। দুর্গাপুরের কার্যকর্তাগণ প্রশিক্ষণ বর্গে সর্বতোভাবে সহায়তা করেন।

স্লামডগ মিলিওনেয়ার বিকৃত করেছে ভারতীয় বাস্তবতা, গোপন করেছে ভারতের সমৃদ্ধি

আদিত্য প্রধান

মুম্বই বস্তিবাসীদের জীবনযাত্রার ভিত্তিতে তৈরি সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'স্লামডগ মিলিওনেয়ার', যার সঙ্গে জড়িত এদেশের গায়ক, সুরকার, টেকনিশিয়ান, এমনকী বলিউড অভিনেতারাও— এবার অস্কার পুরস্কারে বিজয়ী হয়েছে। কিন্তু অস্কার পুরস্কারে ভূষিত হলেও ছবিটি নিয়ে স্পষ্টতই ভিন্নমত পরিলক্ষিত হচ্ছে। যদি আপনি মুম্বই-এর কোনও মাল্টি প্লেক্সে বসে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিটি দেখার পাশাপাশি ক্লিন্ট ইষ্টউডের চেনজেলিং ছবিটি দেখেন, তাহলে 'স্লামডগ মিলিওনেয়ার'-কে ঘিরে যে কোনও সমালোচনাকেই আপনার যথার্থ বলে মনে হবে। চেনজেলিং গত বছরে প্রকাশিত অন্যান্য হলিউডি চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে অনেকগুণে সেরা, এমনকী ক্লিন্ট ইস্ট উডেরও জীবনের সেরা ছবি বলা যায়। এই পিরিয়ড থ্রিলারটি তৈরি হয়েছে গত শতাব্দীর বিশ শতকে লস অ্যাঞ্জেলসের পুলিশদের মধ্যে দুর্নীতিপরায়ণতা, অপদার্থতা আর তাদের বিপজ্জনকভাবে হাতের বাইরে চলে যাবার সত্য ঘটনা নিয়েই। তৃতীয় বিশ্বের মানুষ, তা তিনি ধনী বা দরিদ্র যাই হোন না কেন, নিজেদের আচমকাই খুঁজে পাবেন সেই ছবিটিতে, অন্ততঃ স্লামডগ মিলিওনেয়ারের থেকে বহুগুণ বেশিভাবে। অ্যাঞ্জেলিনা জোলি, যিনি পুলিশের ভূমিকায় একজন প্রবঞ্চ ক, আলস্য আর ঔদাসীন্য এই দু'য়ের রসায়নে ফুটিয়ে তুলেছেন তার চরিত্রটিকে যা তারকাদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। পিরিয়ড চলচ্চিত্র

অ্যাঞ্জেলিনা জোলির কাছে বরাবরই তাঁর অভিনয় দক্ষতা প্রদর্শনের সবচেয়ে উপযুক্ত মঞ্চ । শেষ বার যখন তিনি তাঁর অভিনীত 'অরিজিনাল সিন'-এ একজন ব্যাভিচারিণীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তখন তাঁর অভিনয় সারা বিশ্বের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

সুতরাং পুরো নম্বর অবশ্যই প্রাপ্য ক্লিন্ট ইষ্টউড নির্দেশিত চেনজেলিং-এর। ছবিটির অর্থ সরল ও সাদাসাপ্টা এবং অধিক চটকদারী বর্জিত, যার জন্যই ছবিটির হলিউডে এত পরিচিতি। তাঁর লক্ষ্য ছিল দর্শককে বোঝানো একজন মায়ের উদ্বিগ্নতা দুঃখ-বেদনাগুলো— যিনি পুলিশের কাছ থেকে তার অপহৃত সন্তানের পরিবর্তে পেয়েছেন অন্য একটি শিশুকে, যে এসেছে একজন নির্মল বিজয়ী রূপে।

স্লামডগ মিলিওনেয়ারের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের উৎকর্ষতা নিয়ে প্রশ্নের পূর্বে যে বিতর্কটি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে তা হল এটি ঠিক না বেঠিক। শুরু থেকে ধরলে, পরিচালনার দিক থেকে এবং গল্পের দিক দিয়ে এটি একটি উত্তেজনাপূর্ণ ও আবেগসর্বস্ব ছবি যা আটের দশকে বুকের স্পন্দন বৃদ্ধি করা তামিল ছবিগুলির মধ্যে দেখা যেত। সবদিক ভালোভাবে ভাবনা-চিন্তা করেই হয়তো বিকাশ স্বরূপের উপন্যাসকে প্রযোজিত করা হয়েছে। যেমন আর কে নারায়ণ তাঁর উপন্যাস 'গাইড' প্রসঙ্গে একদা বলেছিলেন, এটি ইতিহাস তৈরি করেছিল, যখন তা দেব আনন্দের ব্যাপক জনপ্রিয়তার দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছিল। বলা নিষ্প্রয়োজন আল্লা রাখা রহমানের সঙ্গীত যা অন্ততঃ শোনা গিয়েছে তা অতি বিশ্রী। এক রাতের মধ্যেই তিনি নাকি গান রচনা করে এতে সুর দিয়েছেন। যদি গোল্ডেন গ্লোবের বিচারকরা রহমানের প্রথম দিকের যেমন— ইন্দিরা, কাদহালান প্রভৃতি ছবির গানগুলি দিয়ে বিচার করেন তবে তাঁরা তাঁদের ভুলটা বুঝতে পারবেন। ছবিটি তাড়াহুড়ো করে শেষ করা হয়েছে। স্লামডগ মিলিওনেয়ার টেকনিক্যাল টীমের অনেক সদস্যই তা স্বীকার করে নিয়েছেন। এবং এ আর রহমানের পরিচিতি তাঁর নিজের পছন্দসই সময়ে নিজস্ব ঘরানার সঙ্গীত পরিবেশনার জন্য। এই তাড়াহুড়ো যাঁরা করেছেন তাঁদের জন্য পুরো প্রোডাকশন টীমকেই মাসুল গুনতে হয়েছে এবং সেই সময় তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে সঙ্গীত পরিচালকের পরিবেশনার ক্ষেত্রেও। আর রহমানকে নিয়ে এত কথা বলার একটাই কারণ, তার সঙ্গীত পরিচালনায় 'গ্লোডেন গ্লোবে'র মতো প্রাইজ ছিনিয়ে এনেছে সিনেমা জগতে।

এবার আসা যাক সিনেমার কাহিনী নিয়ে। বাস্তব চিত্র দেখানো হয়েছে বলে যারা হাততালি দিচ্ছেন তাদের কাছেও হয় তো কাহিনীর চিত্রায়ণে ড্যানি বয়ালের কূট কৌশলটা নজর এড়িয়ে গেছে। বাস্তব দেখানো হয়েছে এটা বাস্তব। কিন্তু কতটা বাস্তব, কতটা নয় তা দেখাটাও আর একটা বাস্তব। ছবির নামটা নিয়ে কখনও ভেবেছেন। যদি 'স্লামডগ মিলিওনেয়ার'-এর গোদা বাংলা করা হয় তাহলে কী অনেকটা বস্তির কোটিপত্তি কুত্তা দাঁড়ায় না? এটা শোনার পর হয়তো রাগ হচ্ছে। এতক্ষণ পেপারটাও বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু এটাও তো বাস্তব। বাস্তব সবর্দাই বাস্তব।

বিদেশী পরিচালক বয়াল তাঁর ছবিতে সর্বত্রই দেখাতে চেয়েছেন ভারতের মতো একটা দেশে যেখানে দারিদ্র্য, অন্ধকার, বস্তির জীবনই এখানকার একমাত্র বাস্তব।

হাতি সাপুড়েদের দেশ কীভাবে মিলিওনেয়ার হয়ে উঠল, বয়াল তারই ছবি

তুলে ধরেছেন বইটিতে। আর এই দারিদ্র্যের বাস্তবতা দেখেই অনেকে হাততালি দিচ্ছেন। কিন্তু অনেকেই গভীর ভাবে লক্ষ্য করেননি কীভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিকে ছোটো করে চিত্রায়ণ করা হয়েছে। ড্যানি বয়াল যেভাবে ভারতকে ছোটো করে দেখিয়েছেন, অতটা খারাপ অবস্থা ভারতের কখনই ছিল না।

ছবির শুরুটাই হচ্ছে 'হু ওয়ান্টস টু বি আ মিলিওনেয়ার' শো থেকে। প্রশ্ন রাখছেন অনিল কাপুর। উত্তর দেবার জন্য অপরদিকে বস্তির ছেলে জামাল মালিক। সে তার ছোটো বেলার স্মৃতি থেকে একটার পর একটা উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। জামালের পুঁথিগত বিদ্যা কম। সে এমন একটা স্কুলে লেখাপড়া শিখেছে, যেখানে ইংরেজি চরিত্র মুখস্থ করানো হয়েছে। সেখানে সে 'সত্যমেব জয়তে' পড়েনি। অথচ প্রথম প্রশ্নর উত্তর ছিল 'সত্যমেব জয়তে'। বইয়ে দেখানো হয়েছে জামালকে যখন পুলিশ অফিসার (ইরফান খান) এই বিষয়ে প্রশ্ন করলেন, জামাল তার উত্তরে

সে পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে চৌপাটির ভেলপুরির দাম জানতে চায়। সত্যমেব জয়তের সঙ্গে ভেলপুরির দামের সম্পর্ক কিন্তু কোথাও নেই। প্রশ্ন উত্তরের মধ্য দিয়েই বয়াল কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তিনি দেখিয়েছেন জামাল আর সেলিমদের বস্তিটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শেষ হয়ে গেল। এটা বাস্তব। এখানে কোনও আপত্তি ওঠে না, যদি তিনি ঘটনায় রং না মেশাতেন। ছবিতে দেখিয়েছেন একদল হিন্দু ছুটে আসছে মুসলিম মারো শ্লোগান তুলে। ছবির সাইড সিনে ভেসে উঠছে বাচ্চা ছেলেকে রাম সাজিয়ে পরিবেশনের ছবি। রামের চোখ-মুখে হিংসার আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। আপনি একবার বুকে হাত দিয়ে ভাবুন তো— কখনও রামচন্দ্রের ছবিতে আপানি এত হিংসা দেখতে পেয়েছেন?

আর তাছাড়া হিন্দুরা কী কখনও এত দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন? হিন্দুরা যদি সত্যই সাহসিকতার পরিচয় দিত, তাহলে মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের এত বাড়-বাড়ন্ত থাকত না। আমেরিকানরা কৃষ্ণাঙ্গ ও ভারতীয়দের ওপর যে অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল, ড্যানি বয়াল কী পারতেন সেই ছবি তুলে ধরতে? আর তার সাইড সিনে যীশুকে দাঁড় করাতে?

ছবির মধ্যেও রয়েছে বহু ফাঁক ফোকর। বস্তি ধ্বংসের পর, সেখানকার আর কোনও ছবিই ড্যানি বয়াল দেখাননি। দেখাননি সেখানকার মানুষদের অবস্থা। দেখাননি তার ওপর সরকারের ভূমিকাও। যা দেখানোটা বাস্তব ছিল। কিন্তু সেই বাস্তব কোথায়?

এরপরই কাহিনী ঘুরে গেছে। ড্যানি দেখিয়েছেন বাচ্চা মেয়ে লতিকা আর দুই ভাই সেলিম জামালের বিচ্ছেদ। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখানো হয়েছে কীভাবে একশ্রেণীর গুন্ডারা বাচ্চাদের অঙ্গাংশ কেটে তাদের ভিখারী বানাচ্ছে। তাদের মুখে ঘনশ্যামের নাম ঢুকিয়ে দিয়ে ভিক্ষা করানো হচ্ছে। বাচ্চা বাচ্চা ভিখারীরা 'দর্শন দাও ঘনশ্যাম' বলে গান করছে। ঘনশ্যাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণর নাম, এবার আপনিই একবার ভাবুন। মুম্বই-এর কতজন ভিখারীর মুখে এই গান শোনা যায়। তাদের মুখে তো লেটেস্ট হিন্দী সিনেমার গানই বেশি শোনা যায়। শুধু এইটুকু দেখিয়েই ক্ষান্ত হননি বিদেশী পরিচালক। দেখিয়েছেন সামান্য টাকার বিনিময়ে তারা বিদেশী পর্যটকদের কীভাবে ঠকাচ্ছে। এখানেও ছোটো করে দেখানো হয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতিকে।

এরপরের ঘটনা সেলিম জামালদের ট্রেনের কামরায় কামরায় ঘুরে বেড়ানো আর ভিক্ষার দৃশ্য। সেদৃশ্যও এত কুরুচিকর হিসাবে পরিবেশন করা হয়েছে তাতে বাস্তবের থেকে রঙ মেশানোর ছাপই বেশি ধরা পড়েছে। দেখানো হয়েছে বস্তি, খোলা শৌচাগার, দেহব্যবসা, ভিক্ষাবৃত্তি, দায়িত্বজ্ঞানহীন কলসেন্টারের চিত্র। ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এ সবই—এর বাইরে যেন কোনও ভারত নেই।

এর ওপর যদি বলতে হয় সিনেমায় যা দেখানো হয়েছে তা সত্য, তাহলে প্রশ্ন ওঠে বয়ালের দেশে কী এগুলি নেই!

একজন বিদেশী পরিচালক ভারতকে হীন প্রমাণ করল, আর আমরা হাততালি দিলাম। প্রশ্নটা এদেশের নাগরিক হিসাবে — ভারতবাসী হিসাবে নিজেকে করুন।

শব্দরূপ - ৪৯৯

স্বরূপ দে

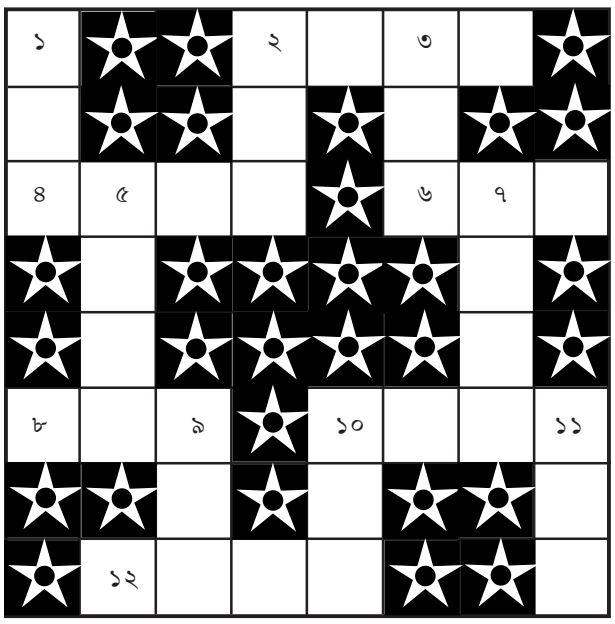

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ২. দেবতাদের নামাঙ্কিত উত্তরীয় বিশেষ, দুয়ে মাতা ৪. অনেক — — পোড়ান, প্রথম দুয়ে বৃক্ষের কঠিন অংশ, শেষ দুয়ে বিচালি ৬. গৃহচুড়া, ছাদের উপরিস্থ গৃহ, প্রথম দুয়ে শক্তি ৮. প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ ১০. ব্যাসদেবের পিতা, মধ্যে লাগাম ১২. ক্রমাগত প্রবল বৃষ্টির শব্দ, দুয়ে-তিনে মধ্যস্থল।

উপর-নীচ ঃ ১. স্বর্গের এই অপ্সরা গৌরীর জননী ২. বিশেষণে একগুয়ে, জেদি ছাড়ে না এমন ৩. তৎসম গোয়ালা, একে-তিনে উলমার ক্রিকেটার ৫. কথ্যে কলকাতার ঠনঠনিয়া নামের প্রসিদ্ধ জায়গা, শূন্য ৭. রাম এর দুই তনয় ৯. মায়ের মা ১০. উণা, পশুর লোম ফারসি শব্দে ১১. দেশি শব্দে মনসামঙ্গল গান।

সমাধান শব্দরূপ ৪৯৭

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯।
দেবলীনা গঙ্গোপাধ্যায়,
চারাবাগান, হাওড়া।
গদাধর মণ্ডল, মানব মণ্ডল,
নাহিনা, বীরভূম।
ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া,
বাগনান, হাওড়া।

■	মা	■	ফু	■	গে	লা	স
■	গো	পা	ল	■	রু	■	ন
ক	■	■	ফ	তু	য়া	■	কা
পা	ট	কে	ল	■	■	■	বে
ল	■	■	■	কে	তু	রা	হু
কু	■	সু	মি	ষ্ট	■	■	লা
ন্ড	■	বা	■	বি	গ্র	হ	■
লা	ল	স	■	ষ্টু	■	রি	■

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ১৬ মার্চ ২০০৯ সংখ্যায়।

‘বিমানপনা’ তোষণ এবং ইতিহাস অজ্ঞতার অন্য নাম

বিশাখা বিশ্বাস

রাষ্ট্রসঙ্ঘে এম সি চাগলার প্রজ্ঞা পারমিত বক্তৃতায় বিচলিত হয়ে আপন আসন হতে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বলেছিলেন পাক-প্রতিনিধি জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টো ঃ দ্য ইনডিয়ান ডগ্ ফেড বাই দ্য হিন্দুজ মে গো অন বার্কিং, উই ওন্ট স্পেয়ার কাশ্মীর (হিন্দু অন্নে পালিত ভারতীয় কুত্তা চীৎকার করে চলুক, আমরা কিন্তু কাশ্মীরকে ছাড়বো না)। চাগলাজী বক্তৃতা থামিয়ে ঈষৎ হেসেছিলেন। ঈষৎ হেসে চাগলাজী সেদিন বলেছিলেন, আই নো মাই হিন্দু আন্টি লক্ষ্মীবাঈ ওয়াজ মাই ফ্রেন্ডস মাদার, হেন্স, নাইদার আই ক্যান ডিজ অনার দ্য হিন্দুজ নর আই ক্যান কমিট ‘ভুট্টোমি’, দ্য ওয়ার্ড দ্যাট নট্ অনলি গিভস্ ভেন্ট টু দ্য ইগ্নর‍্যান্স ইন হিস্ট্রি বাট অলসো এক্স্প্রেসেস্ দ্য সেম মিনিং অব সিলিনেস (আমি জানি আমার বন্ধুটির জননী ছিলেন লক্ষ্মীবাঈ নামের জনৈকা হিন্দু নারী এবং তাই আমি হিন্দুদের যেমন অসম্মান করতে পারি না, তেমনি আবার ‘ভুট্টোমি’-ও করতে পারি না, কেননা ওই শব্দটি কেবল ইতিহাস অজ্ঞতাকেই ব্যক্ত করে না, পরন্তু তা বাচালতার সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়।

সে প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার ইতিহাস। সেই থেকে ভারতের রাজনৈতিক বক্তব্য-বিবৃতি, প্রবন্ধ এবং আলাপ-আলোচনায় ‘ভুট্টোমি’ শব্দটি যুগপৎ বাচালতার প্রতিশব্দ এবং ইতিহাস অজ্ঞতার সমার্থক শব্দ (টার্ম ইন এ সেনটেস) হিসেবে বহুদিন ধরে ব্যবহৃত হতো। ইতিহাসে কোনও শব্দই তো মরে না — ইথার তরঙ্গে ভেসে বেড়ানো সব শব্দই কোনও না কোনও সময়ে আমাদের সম্মুখে আবার উপস্থিত হয়, যদিও একই বাচ্যার্থে বা ব্যক্তর্থে নয় (নট ইন দ্য সেম কনোটেশন অ্যাণ্ড ডেনোটেশন)। ইতিহাসের সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে যে শব্দটি নতুন আঙ্গিকে আমাদের সম্মুখে আবার আজ ফিরে এসেছে তা হল ‘বিমানিপনা’।

বত্রিশ বছরের শতধাদীর্ণ কীটদ্রষ্ট বিরোধি-ভূমিকাকে পেছনে ফেলে ইতিহাস এখন সামনের দিকে খুঁজে নিতে চাইছে ঐক্যের পথ। বারুদগন্ধ এবং নিঃশব্দ ও সশব্দ সন্ত্রাসের শংকাকে বুকের তলায় নিয়েও সেই পথে চলেছে মানুষ। কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে ক্রোধের রক্ত হয়ে জমা হচ্ছে মানুষের বিক্ষোভ। লালপন্থীদের কিছু কোলের কুত্তা বিরোধির দুটি দলে মিলেমিশে থেকে মানুষকে বুঝতে দিতে চাইছে না — সাম্প্রতিক ইতিহাসের ধারাকে। রাগে দুঃখে, বেদনায়-অভিমানে নতুন বিকল্পের অভিযানে তাই যেতে চাইছে নতুন প্রজন্মের মানুষ।...

মানুষের সেই ঐক্যবদ্ধ জোটে ভোটের আগেই চিরকালের মতো আবার চঞ্চ ল হয়ে উ ঠেছেন লালবাংলার লাল পন্থী বিমানবাবুরা। আবার মানুষ নামের কিছু লালপন্থীদের চিরচেনা এজেন্টও বসছে নড়েচড়ে। এরা কেউ বলছেন, মমতা ব্যানার্জী যে আবার বিজেপিতে / এনডি এ -তে যাবে না তার গ্যারান্টী কোথায় (এইসব বেচাল, বাচাল এবং ইতিহাস অজ্ঞরা ভুলে গেছেন, সনিয়া-কংগ্রেসের পায়ে মোজা পরাবার ঠিকে নেবার আগে ১৯৮৯ সালে শহীদ মিনারকে সাক্ষী রেখে কোন্ পার্টির কোন্ নেতারা ধরেছিল বিজেপির অটল বিহারীর হাত)। আবার দিনে সবুজ, রাতে লাল কংগ্রেসের কোনও কোনও ‘তরমুজ’ জাতীয় রাজ্যস্তরে নেতা-নেত্রীরা বলে চলেছেন, দিল্লী গিয়ে জানাই জোটে নাই, রাজ্যে ফিরে বলি জোট চাই। তবে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে কারা কোথায় দাঁড়িয়ে তার স্পষ্টীকরণ চাই (ইংগিতটি মমতা এবং এনডি-এর দিকে)। এরা কেউ মন্ত্রী, কেউ ঘোড়া, কেউ নেহাতই বোরে — সবারই পেছনে খেলোয়াড় সেই লালপন্থীরা। এরা কেউ বিমান, কেউ মানস, কেউ কেউ দীপা দাসমুন্সী — এদের কারও পার্টি শক্ত ভিতে শক্তিশালী সংগঠনে কাশীর শানবাঁধানো ঘাটের মতো শক্তপোক্ত কিন্তু পুঁজিপতিদের পদচিহ্ন বুকে ধরেই সেই লাল বর্ণের পাষাণ পার্টির ক্ষয়।

এদের কেউ কেউ আবার লালদের বর্জ্য মল-মূত্র থেকেই আহার্য্য খুঁজে মেটায় তাদের চিত্তবৃত্তি — ইতিহাসে কথ্য ভাষায় গ্রাম-বাংলায় একটা করে এদের ছোট্ট নাম আছে — এদের কারো নাম দালাল, কেউ নিছকই ফঁড়ে।...

অর্থগত সঙ্গতি মোটামুটি একগোত্রে রেখেই যুগে যুগে নতুন নতুন শব্দ নতুন আঙ্গিকে ব্যঞ্জনায় আসে। পরাধীনতার যুগে যাদের নাম ছিল ইংরেজের ‘চর’, নকশাল আমলের ‘লাল প্রহরীরা’ তাদের বলতো ‘ফেউ’। আবার সিদ্ধার্থ জমানায় তাদের অনেকেই বলা হতো ‘চামচে’। সমাজ-বদলের প্রক্রিয়ায় এরা রূপেতে সবাই আলাদা — বৃত্তিতে সবাই এক, এদের সকলেই কারও না কারও এজেন্ট। এরা কেউ বিমান, কেউ মানস, কেউ দীপা। এজেন্ট শব্দটায় বড় শ্রুতিকটু দোষ — তাই এদের নাম থেকে শ্রুতিসুখকর এ্যাব্স্ট্রাক্ট নাউন ‘বিমানিপনা’ পুঁজিপতি তোষণের অন্য নাম, মুসলিম তুষ্টিকরণের বিকল্প নাম, বিজেপির সখ্যতা সম্পর্কে ইতিহাস-অজ্ঞতার সেনো নেম (সমর্থক শব্দ)।

এই ‘বিমানিপনা’ শব্দটার সাথে কেবলমাত্র মানস-মান্নান-শঙ্কর-দীপার নামই যুক্ত হয়ে যায়নি — সাম্প্রতিক ইতিহাসে ‘বিমানীপনার’-র সাথে হঠকারীতায় যুক্ত হয়ে গেছে আরও এক বিশিষ্ট নাম ঃ মমতা ব্যানার্জী। যদিও ইতিহাস মমতার সাজে পোশাকে বহিরঙ্গে পরিয়ে দিয়েছে নিখাদ বামবিরোধিতার দুর্ভেদ্য বর্ম, তবু তার অবিমৃষ্যকারিতায় রচিত হচ্ছে সেই সড়কপথ যে পথ দিয়ে এবারেও বিমানবাবুরাই করবেন ক্ষমতা প্রাপ্তির উৎসব-মিছিল। যে এন ডি এ তার জন্য রেলমন্ত্রক পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছিল, যে এন ডি এ-র সর্বাগ্রগণ্য অটলজী-আদবানীজী নেতৃত্বের সর্বোচ্চ স্তরে তাকে আস্থাভাজন এবং স্নেহভাজন করে নিয়েছিলেন, বছর দুয়েক আগে যে এন ডি এ খোদ রাষ্ট্রপতি সকাসে মিছিল করে গিয়ে রাস্তায় মরার হাত থেকে সসম্মানে তার জীবনের সুরক্ষা দান করেছিল — কেবল মুসলিম তোষণ এবং কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস অজ্ঞতার কারণে কার্যত এবারও তিনি শেষ পর্যন্ত লাল-তেরঙ্গা এজেন্সীর পাতা ফাঁদে হয়ে গেলেন— লাল এজেন্সীর ‘ক্যাপটীভ কম্যাণ্ডার’।

ইতিহাসের দর্পণে প্রতিভাত মমতার এই ‘বিমানিপনায়’ বিজেপি বর্জন এবং কংগ্রেসের হস্তধারণ জন্য এবারেও তিনি তলিয়ে যাবেন লালবাদের চোরাবালিতে — তার বহু ভুলের পরও এবারের ভুলের কানাগলিতে যার নতুন নাম হবে সেই ‘বিমানিপনা’। ‘বিমানিপনা’ হল সেই শব্দ যা ইসলাম তোষণ, পুঁজিবাদ ও কংগ্রেসের দালালীপনা এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিজেপির কাছে ঋণের প্রসঙ্গে ইতিহাস অজ্ঞতার অন্য নাম — এবারের নির্বাচনে যেমন চিনতে হবে প্রত্যেককে, তেমনি চিনতে হবে বিমানবাবুদের সাথে সকল বর্ণের সকল শ্রেণীর ‘বিমানিপনাকে’-ও....

(রচনার মূল উৎস বিমানবসুর উক্তি ঃ মমতা যে সাম্প্রদায়িক বিজেপি/এনডি এ-র সাথে আবার যাবেন না তার গ্যারান্টী কি)

চিন্তাশীল মননে নয়া দিশায় তাৎপর্যপূর্ণ বিদ্যার্থী পরিষদের সম্মেলন

মঞ্চে বিদ্যার্থী পরিষদের নেতৃবৃন্দ।

অর্ণব নাগ।। শিক্ষায় সংখ্যালঘু তোষণ রুখতে ও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের দাবিতে বীরভূম জেলার তারাপীঠে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ২৬ তম রাজ্য সম্মেলন হয়ে গেল। গত ১৩ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি সাধক বামাক্ষ্যাপার পুণ্যভূমিতে অনুষ্ঠিত হয় এই সম্মেলন। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ১৫০ জন কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

পরবর্তী রাজ্য সভাপতি হিসাবে পূনঃনির্বাচিত হয়েছেন অধ্যাপক রবি রঞ্জন সেন এবং প্রথম মহিলা রাজ্য সম্পাদিকা হিসাবে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ফিল-র ছাত্রী পারুল মন্ডল।

রাজ্যের শিক্ষায় বর্তমান পরিস্থিতি বিশেষ করে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থেকে শুরু করে একের পর এক বেআইনি মাদ্রাসা অনুমোদন ও কামিল ডিগ্রিধারীদের রাজ্যের এস এস সি পরীক্ষায় বসার অনুমোদনের মতো মুসলিম তুষ্টিকরণ, রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি এবং সেই সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে সার্বিকভাবে রাজ্যের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অধ্যাপক গৌর চন্দ্র গড়াই, ডঃ সুভাষ সাহা সহ শিক্ষাক্ষেত্রের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রান্ত প্রচারক রমাপদ পাল, পরিষদের ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক শ্যাম মোগো, বিজেপির রাজ্য সংগঠন সম্পাদক অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সর্বভারতীয় কার্যকর্তা ও অনুপ্রবেশ বিরোধী আন্দোলনের সংযোজক সুনীল বনসল। পরিষদের প্রাদেশিক সংগঠন সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী ‘পরিবর্তিত শৈক্ষিক ক্যাম্পাসে বিদ্যার্থী পরিষদের ভূমিকা’— শীর্ষক এক তথ্যমূলক বক্তব্য পরিবেশন করেন। সমারোপ বক্তব্য রাখেন বিদ্যার্থী পরিষদের জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য সঞ্জয় মণ্ডল।

সবশেষে প্রাক্তন ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক বিষ্ণু দাসকে বিদায়ী সম্বর্ধনা জানানো হয়।

Swastika
2 March - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

ভোপালে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের দাবি

কৃষকদের ফসলের লাভজনক মূল্য দিতে হবে

সম্মেলন মঞ্চে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান (মধ্যে) এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যের কৃষিমন্ত্রীকে মঞ্চে বসিয়ে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের নেতা ও কর্মীরা তাদের যাবতীয় দাবি-দাওয়া পেশ করল। ঘটনাটি ঘটেছে গত ৪ ফেব্রুয়ারি ভূপালে। ওই দিন কিষাণ সঙ্ঘের এক বিশাল মিছিল সাজাহানী পার্ক থেকে শুরু হয়ে ঐতিহাসিক লাল প্যারেড মাঠে শেষ হয়। মিছিল সেখানে পৌঁছানোর পর হয় জনসভা।

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদক দীনেশ কুলকার্ণী তার বক্তব্যে কেন্দ্র সরকারের কৃষিনীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি দাবি জানান, কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের লাভজনক মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এগ্রো ইকনমি রিসার্চ সেন্টারই বলেছে, গমের দাম কুইন্টল প্রতি ২১৩০ টাকা ধার্য হওয়া উচিত। কৃষি ও কৃষকের প্রতি দুর্লক্ষ্য করার বদলে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে সাহায্য ও সহযোগিতা করা দরকার। শ্রী কুলকার্নি আরও বলেন, কৃষি থেকে ভারত সরকারের ২৩ শতাংশ আয় হয়। সেজন্য বাজেট বরাদ্দের সময় কৃষিতে ২৩ শতাংশ করা উচিৎ। তবে জনজাগরণ ও আন্দোলনের মাধ্যমেই কৃষকদের ন্যায্য দাবি আদায় করতে হবে বলে শ্রীকুলকার্নি মন্তব্য করেন। তাঁর মতে সরকার খাদ্যে স্বয়ম্ভরতার প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার বদলে শিল্পনীতির দিকেই বেশি করে নজর দিচ্ছে। একদিকে 'সেজ'-এর নামে ভূমাফিয়ারা জমি কব্জা করে চলেছে। অন্যদিকে উর্বর কৃষি জমি বিদেশীদের হাতে চলে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান তাঁর ভাষণে বলেন, মধ্যপ্রদেশে গম প্রতি কুইন্টল ১১০০ টাকার কমে বিক্রি করতে দেওয়া হবে না। গত বৎসর রাজ্য সরকার চাষীদের বোনাস দিয়েছিল। এবছর সরকারের কোষাগারে টাকা নেই। রাজস্ব আদায় কম হওয়ার জন্য সরকারের কোষাগার বাড়ন্ত। তবে শ্রী চৌহান প্রতিশ্রুতি দেন যে তাঁর সরকার কৃষকদের দাবি পূরণ করবে। অর্থ এলেই সব দেওয়া হবে। তিনি কৃষকদের খাদ্যভাণ্ডার পরিপূর্ণ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, তাদের প্রাপ্য সরকার কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দেবে।

সম্মেলনে আগত কৃষকদের একাংশ।

অন্যান্য বক্তারা কেন্দ্র সরকারের কৃষিনীতির কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কিষাণ সঙ্ঘের ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক প্রভাকর কেলকর, রাজ্য সভাপতি দয়ারাম ধাকড়, রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী ডঃ রামকৃষ্ণ কুশমারিয়া, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সুরেশ গুর্জর।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে সকল দাবি মেনে কথা দিয়েছেন তার মধ্যে কয়েকটি হল —

(১) গ্রাম এবং কৃষিক্ষেত্রের ফীডার লাইন আলাদা আলাদা হবে।

(২) যে সকল কৃষক নিয়মিত বিদ্যুৎ-এর বিল জমা করেন তাদের ৫০ শতাংশ মকুব করে পরের বছরের জন্য অগ্রিম হিসেবে জমা হবে।

(৩) আগামী আর্থিক বছর থেকে তিন শতাংশ হার সুদে কৃষি ঋণ দেওয়া হবে।

(৪) বাজারে বাজারে আড়ৎদারী সম্পূর্ণ বন্ধ করা হবে।

(৫) সরকার চেকের মাধ্যমে সরাসরি কৃষককে অনুদান দেবে।

এছাড়াও রাজ্য সরকার যা কেন্দ্রের করণীয় এরকম বেশ কয়েকটি দাবি কেন্দ্রকে পাঠাচ্ছে। উল্লেখযোগ্য হল, কৃষিপণ্যের উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কুড়িশতাংশ বেশিতে (লাভে) মূল্য নির্দ্ধারণ। কৃষি জমি এলাকার জন্য আলাদা কৃষি বাজেট প্রভৃতি।

শুধুমাত্র মা-কে নিয়ে এক বিরল অনুষ্ঠান

একেবারে ডানদিকে বনদেবী ভৌমিক। শ্রীমতী সুমিতি ভৌমিককে গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন স্বামী নিত্যবোধানন্দ মহারাজ। বাঁদিকে স্বামী সুপর্ণানন্দ মহারাজ।

সংবাদদাতা ।। মা কি। মা কেমন। শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, অন্তরঙ্গতা দিয়ে তাঁকে কেমনভাবে ভরিয়ে রাখতে হয়। "মাতৃদেব ভব"— ভারতের এই চিরন্তন শিক্ষাকে জীবনে কীভাবে বাস্তবায়িত করতে হয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল গত ১৫ ফেব্রুয়ারি মধ্য কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি সভাগৃহে এক স্নেহময়ী জননী দ্বারা লিখিত স্মৃতিগ্রন্থ "দশ সন্তানের জননী"-র উন্মোচন অনুষ্ঠানে। আয়োজক বাগুইহাটির সোহম পাবলিসিং হাউস।

সেদিন এসেছিলেন কলকাতা ত্রিপুরা ও অসমের বহু বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব ও সংগীত শিল্পীরা। মাতৃপ্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা কালে প্রায় সব বক্তার বক্তব্যে উঠে এসেছে বর্তমান কালের মূল্যবোধের বিপন্ন অবস্থার কথা। প্রাচীন কাল থেকে বিগত শতাব্দীর কয়েক দশক পর্যন্ত মাতা ও পুত্রের মধ্যে যে নিগূঢ় বিমল প্রেমের বেগবান প্রবাহ বহমান ছিল, আজ তা শীর্ণ হতে শীর্ণতর। বর্জ্যবাহী ধারা মাত্র।

বর্তমান ভোগসর্বস্ব বিশ্বায়ণের দুনিয়ায় পাশ্চাত্যের বর্জ্যসম-সভ্যতাকে আপন করতে গিয়ে ভারতীয় সমাজ বিদায় জানাতে চলেছে আপন শাশ্বত ধ্যান-ধারণাকে। জননীকে দেবীজ্ঞান এখন তো প্রায় বিলুপ্ত মানসিকতা। এ বিষয়ে দায়ী যেমন আজকের মায়েরা সমভাবে দায়ী, তাঁদের সুসভ্য পুত্রদের না-মানুষী আচরণ। আগেকার মায়েরা ছিলেন স্নেহ, মমতা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, স্বার্থবোধহীনতার পূর্ণ প্রতিমা। আর এখনকার মায়েদের জীবনে বিম্বিত ভ্রান্তি, স্বার্থপরতা, মাত্রাতিরিক্ত ঐহিক বাসনা যা তাদের সন্তানদের জীবনকেও দুর্বিষহ করে তুলছে। আর এখানেই অঙ্কুরিত হচ্ছে বিষবৃক্ষের বীজ। সন্তান স্বাবলম্বী হয়েই মনুষ্যতের প্রাণীর মতো মা-বাবাকে ত্যাগ করছে, নয়তো নানা অছিলায় দুর্বল, অসহায়, অশক্ত, বাবা-মায়ের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে বাড়ি থেকে বিতাড়ন করছে। এই ভয়াবহ চিত্রটি ফুটে উঠেছে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিচারাধীন সাড়ে চার হাজার মামলায়। যেগুলি নিষ্পত্তি হয়েছে, সেখানে মাননীয় বিচারকরা কঠোর ভাষায় পুত্র-পুত্রীদের তিরস্কার ও বাবা-মায়ের খোরপোষের ব্যবস্থা করেছেন।

কথাগুলি ঘুরে ফিরে উঠে এসেছে, পূর্ণেন্দু শেখর ভট্টাচার্য (স্বাধীনতা সংগ্রামী), কৃষ্ণচৈতন্য মহাপাত্র (প্রাক্তন স্বা-সঃ) জ্যোর্তিময় দাস, প্রলয় মজুমদার, ডঃ নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দেবাশীষ বসু (আবৃত্তিকার), নন্দলাল ভট্টাচার্য, প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, ডঃ নিরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় (সাংবাদিক প্রসার ভারতী), অমিত ভৌমিক, মিহির ভট্টাচার্য (আই জি), অমর পাল (সঙ্গীত শিল্পী), শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'মা' প্রসঙ্গে বক্তব্যের অনুসরণে। বিখ্যাত আন্তর্জাতিক ভাষাবিদ ব্রজগোপাল মুখার্জী আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, এ এক অভাবনীয় অনুষ্ঠান। আজ থেকে সূচনা হল সত্যযুগের।

সমবেত গুণীজন এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সর্বান্তকরণে অভিনন্দন জানিয়েছেন সোহম পাবলিসিং-এর কর্ণধার ও অধ্যাত্ম-লেখক ভগবদ ভৌমিক ও সেই সঙ্গে ভৌমিক পরিবারকে — যেহেতু সমাজ আজ ভয়ঙ্কর মূল্যবোধ বিপর্যয়ের মুখে। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অনুষঙ্গ হিসাবে ছিল গুণীজন সম্বর্ধনা, রোজি দত্ত পণ্ডিত ও মাধুরী মাইতির ভক্তি সঙ্গীত এবং রাধাকান্ত সরকারের শ্রুতি নাটক।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি চলে দুপুর ২টো থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত।

পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে পুরীই প্রথম

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। দর্শনার্থী তথা পুণ্যার্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে জগন্নাথ দেবের পুরীই সর্বাগ্রে। কেন্দ্রীয় ট্যুরিজম দপ্তরের ২০০৮ সালের হিসাব অনুযায়ী ভারতবর্ষের বিভিন্ন দর্শনীয় কেন্দ্রগুলির মধ্যে পুরীতে আগত দর্শনার্থীর সংখ্যা ২২ লক্ষ ১২ হাজার ৪৬৬ জন। এছাড়াও বিদেশী দর্শনার্থীর সংখ্যা ১৭ হাজার ২৫ জন। বিদেশী দর্শনার্থীদের মধ্যে বেশি সংখ্যক এসেছে বৃটেন, ফ্রান্স এবং জার্মানী থেকে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত পুণ্যার্থীদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে গেছেন ৪ লক্ষ ১৩ হাজার ৬৭ জন। এছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ৭৯ হাজার ৬৪৮ জন, ৩৫ হাজার ৬২০ জন বিহার থেকে, ৯ হাজার ৭৩৪ জন পাঞ্জাব থেকে, গোয়া থেকে ৪৪২ জন, পন্ডিচেরী থেকে ৮৮৪ জন, ত্রিপুরা থেকে ৩ হাজার ৯৭ জন, তামিলনাড়ু থেকে ৩৪ হাজার ১২৪ জন, মহারাষ্ট্র থেকে ৫৯ হাজার ৫১৫ জন এবং ওড়িশার পুণ্যার্থী ছিলেন ১২ লক্ষ ১০ হাজার ৪৫০ জন।

বিদেশের মধ্যে বৃটেন থেকে ২ হাজার ২৯০ জন, ফ্রান্স থেকে ১ হাজার ৫৬৮ জন, জার্মানী ১ হাজার ৩৯২ জন, ৩৯৮ জন আমেরিকা থেকে, জাপান থেকে ১ হাজার ৩০২ জন, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৬০২ জন, সুইজারল্যান্ড থেকে ৫৩৪ জন, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে ৪৬৮ জন, স্পেন ৬১৯, হল্যাণ্ড ৬৮৪, কানাডা ৬৬১, চীন ২৬৯ এবং বাংলাদেশ থেকে ১৮৪ জন দর্শনার্থী এসেছেন।

স্বস্তিকা

আগামী ৯ই মার্চ প্রকাশিত হবে

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের ৫০০ বৎসর স্মরণে

বিশেষ সংখ্যা

লিখেছেন

ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য, ড. সুজলা কুন্ডু, সোমনাথ নন্দী, ব্রজগোপাল মুখার্জী, কিশোরীদাস বাবাজী প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকরা।

এছাড়া নিয়মিত বিভাগগুলি থাকছেই।

নিয়মিত সংখ্যার আকারেই প্রকাশিত হচ্ছে। দাম চার টাকা।

সত্বর কপি বুক করুন।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com